সম্মিলিত ভাবনা

২

দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

সম্মিলিত ভাবনা
Sammilita Bhabana

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ২০১৬

প্রকাশনায় :
দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

প্রচ্ছদ : সুশীল দাস

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি:
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

দাম : ২০ টাকা

প্রশ্ন : পার্টির গঠনতন্ত্র ও বিধিমত অনুযায়ী "সর্বভারতীয় পার্টি কংগ্রেস হচ্ছে গোটা দেশের জন্য পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা।" পার্টি কংগ্রেসের কাজ ও ক্ষমতা সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে— "পার্টি কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্রের সংশোধন ও পরিবর্তন করা" এবং "সমসাময়িক পরিস্থিতিতে পার্টির রণকৌশলগত লাইন" নির্ধারণ করবে পার্টি কংগ্রেস। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পার্টির প্লেনাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতায়। সেখানে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পার্টির কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। তাহলে নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় পার্টি কংগ্রেস ও প্লেনামের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : কেন্দ্রীয় কমিটি কিংবা পার্টি কংগ্রেস কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য পার্টির বৃহত্তর সভা আহ্বান করতে পারে। গঠনতন্ত্রের ১৫ নং ধারার ১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—"কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজন মনে করলে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা কিংবা প্লেনাম কিংবা সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে পারবে। প্লেনামের প্রতিনিধি সংখ্যা ও প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।"

আসন্ন প্লেনাম, আপনি যেমনটা বলেছেন, "পার্টি কর্মসূচি কিংবা রণকৌশল নির্ধারণের জন্য" ডাকা হয়নি। এ কাজ ২১ - তম পার্টি কংগ্রেসেই সম্পন্ন হয়েছে।

বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত ২১-তম পার্টি কংগ্রেসে (এপ্রিল, ২০১৫) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চলতি বছরের মধ্যে প্লেনাম সংগঠিত করতে হবে। যেহেতু পার্টি কংগ্রেস এ যাবত অনুসৃত রাজনৈতিক রণকৌশলের পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করেছে এবং নতুন রণকৌশল গ্রহণ করেছে, সেইহেতু এই নতুন লাইন বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ সময় ও প্রস্তুতি নিয়ে প্লেনাম সংগঠিত করতে হবে। পার্টি কংগ্রেস অনুভব করেছে পার্টি সংগঠনের বিষয়ে আলাদাভাবে আলোচনা সংগঠিত করা প্রয়োজন। এ কারণে এই সাংগঠনিক প্লেনাম, যা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্লেনাম, সম্মেলন কিংবা কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা পার্টির ইতিহাসে অতীতেও অনুষ্ঠিত হয়েছে নানান রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে। অতীতে সি পি আই (এম)'র দুটো প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬৮ সালে, বর্ধমানে, মতাদর্শগত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। দ্বিতীয় প্লেনামটি হয়েছে ১৯৭৮ সালে, সালকিয়ায়, সংগঠনের বিষয়ে আলোচনার জন্য। পার্টি কর্মসূচি সময়োপযোগী করার জন্য ত্রিবান্দ্রমে

অনুষ্ঠিত হয়েছিল সর্বভারতীয় পার্টি সম্মেলন, ২০০০ সালে। বিজয়ওয়াড়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা, ২০১০ সালের আগস্ট মাসে। এটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল উদ্ভূত নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও পার্টির রণকৌশলগত লাইন নির্ধারণের জন্য। এ ধরনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত করার আগে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজনীয় দলিল তৈরি করে এবং পার্টির অভ্যন্তরে আলোচনার ব্যবস্থা করে থাকে।

প্রশ্ন : সি পি আই (এম)-র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সবস্তরের কমিটি নির্বাচিত হয়ে থাকে। গঠনতন্ত্রের ১৫ নং ধারা অনুযায়ী বিদায়ী কমিটি সম্মেলনের সামনে একটি প্যানেল প্রস্তাব করে। প্রস্তাবিত প্যানেলের যে কোনও নাম সম্পর্কে আপত্তি উঠতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি সাপেক্ষে নতুন নামেরও প্রস্তাব করা যেতে পারে। তখন অতিরিক্ত নাম বা নামগুলিসহ প্রস্তাবিত প্যানেল গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটে দেওয়া হয়। যদি অতিরিক্ত নাম না আসে তবে প্রস্তাবিত প্যানেল হাত তোলা ভোটে গৃহীত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রশ্ন হলো—

ক) সম্মেলনের একেবারে শেষ দিকে কেন প্যানেল প্রস্তাবিত হয়? তাতে কোনও আলোচনা করা যায় না।

খ) প্রায়শই 'সর্বসম্মত' কমিটি নির্বাচনের নামে সভাপতিমণ্ডলী কিংবা বিদায়ী কমিটির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত নাম প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানো হয়। সি পি আই (এম) -র গঠনতন্ত্রে কি এ ধরনের 'সর্বসম্মত' ধারণার সুযোগ রয়েছে?

গ) যদি ভোট হয় তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তাদের সক্রিয়তার পক্ষে প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয় না। বিরাট সংখ্যক সদস্য/প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে কমিটি নির্বাচন করতে গিয়ে একজন প্রতিনিধির পক্ষে অন্য সব সদস্যের কর্মতৎপরতা জানা বাস্তবে সম্ভব নয়। নির্বাচন প্রার্থীদের নিজের কথা বলতে মিনিট পাঁচেক করে সময় দেওয়া যায় না কি? তাহলে নির্বাচন প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হতে পারে। আমি কি ভুল বললাম?

উত্তর : ক) সম্মেলনের শেষ দিকে কমিটির প্যানেল প্রস্তাবিত হয়। কারণ, রাজনৈতিক -সাংগঠনিক রিপোর্টের উপর আলোচনা ও রিপোর্ট গ্রহণের পরই একমাত্র কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হয়। রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের

অভিমুখ নির্ধারণ করে থাকে এবং এর উপর ভিত্তি করেই নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়। কারণ, এই কমিটিকেই নির্ধারিত কর্তব্য বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিতে হয়।

খ) বিদায়ী কমিটির প্রস্তাবিত প্যানেল উত্থাপনের পর যদি অতিরিক্ত নামের প্রস্তাব আসে তাহলে বিদায়ী কমিটির নেতৃত্বের অধিকার রয়েছে প্যানেল গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দেখাবার। তারপরও যদি কোনও প্রতিনিধি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তাহলে সেটা ওই প্রতিনিধির অধিকার, এই অধিকার খর্ব করা যাবে না। সব সময়েই চেষ্টা হয় একটা সাধারণ বোঝাপড়ার (যাকে আপনি বলেছেন 'সর্বসম্মত') ভিত্তিতে কমিটি গঠনের। যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের পদ্ধতি মেনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভোটের প্রচার কিংবা লবি করার অধিকার গঠনতন্ত্রে দেওয়া হয়নি। কাদের নিয়ে কমিটি গঠিত হলে ভাল হয়, এ সম্পর্কে সম্মেলনকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। প্রার্থীদের কথা বলার সুযোগ দান প্রার্থীর যথাযথ মূল্যায়নে প্রতিনিধিদের তেমন কোনও সাহায্য করবে না। পার্টি সম্মেলনকে প্রচার-বক্তৃতার মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রশ্ন: ক. ২০- তম পার্টি কংগ্রেসের পর পার্টি সভ্যসংখ্যা ১০ লক্ষ ৫৮ হাজার ছাড়িয়েছে। কিন্তু তারপরও পার্টি পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা ছাড়া অন্য রাজ্যে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে কেন? ১৯৬৪ সালে সি পি আই (এম) গঠনের পর থেকে এই তিন রাজ্যের বাইরে আমরা যেতে পারছি না। এক্ষেত্রে পার্টির দুর্বলতা - ত্রুটি কোথায়?

খ. সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে কেরালা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে আমাদের নির্বাচনী ফলাফল খুবই খারাপ হয়েছে। এর কারণ বিশদভাবে খুঁটিয়ে দেখা দরকার এবং এটা করতে হবে ২০১৯-এ অনুষ্ঠেয় লোকসভা নির্বাচনের আগেই। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

উত্তর ক. আপনি যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে ২১-তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত বিভিন্ন দলিলে। তারপর সাংগঠনিক প্লেনাম হলো। সেখানেও এই ব্যাখ্যা রয়েছে। ২১- তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক - রণকৌশলের পর্যালোচনা এবং সাংগঠনিক প্লেনামে গৃহীত রিপোর্ট ও প্রস্তাব— এই দলিলগুলি আপনাকে পড়ে দেখার

অনুরোধ জানাচ্ছি। পার্টির ওয়েবসাইট http:// www.cpim.org -এ আপনি এগুলো পাবেন।

খ. আপনি ঠিকই বলেছেন কেরালা ছাড়া অন্য রাজ্যে আমাদের নির্বাচনী ফল খারাপ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আপনার অজানা নয় আশা করি। তৃণমূল কংগ্রেসের হিংস্র আক্রমণ ও সন্ত্রাসের কবলে রয়েছে আমাদের পার্টি ও বামফ্রন্ট। এটা চলেছে গত পাঁচ বছর ধরেই। বিধানসভা নির্বাচনের পর আমাদের থেকে দূরে সরে যাওয়া জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে পার্টি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এবং শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন সমস্যা ও ইস্যু নিয়ে যৌথ আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তুলতে পার্টি উদ্যোগ নিয়েছে। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে পার্টি ও বামফ্রন্টের কর্মী ও সমর্থকদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। এই আক্রমণ মোকাবিলায় পার্টি কর্মী ও সমর্থকদের রক্ষায় ও প্রতিরোধের জন্য ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আসাম ও তামিলনাড়ুর নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত করেছে। এই দুটো রাজ্যে অতীতে গৃহীত নির্বাচনী কৌশল থেকে আলাদা কৌশল এবার নেওয়া হয়েছে। তামিলনাড়ুতে পার্টি এ আই এ ডি এম কে কিংবা ডি এম কে-র সঙ্গে কোনও ধরনের নির্বাচনী বোঝাপড়ায় যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। আসামেও এ জি পি-র মতো দলগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়ার চিন্তা পার্টি পরিত্যাগ করে। ২১-তম পার্টি কংগ্রেসের আলোচনায় উঠে এসেছিল যে আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে আমাদের নির্বাচনী সমঝোতার কারণে আমাদের নিজস্ব শক্তি হ্রাস পেয়েছে।

তাই, এবারের নির্বাচনে আমরা অতীতের কৌশল পরিত্যাগ করি। পার্টির সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে পার্টি এই দুটি রাজ্যের কোথাও কোনও আসনে বিজয়ী হতে পারেনি। পার্টির নিজস্ব শক্তি বাড়িয়ে এবং সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে শ্রেণী ও গণসংগ্রাম সংগঠিত করার মাধ্যমেই কেবল আমাদের অগ্রগতি সম্ভব হবে এবং তা নির্বাচনী ফলাফলেও প্রতিফলিত হবে। এই দুই রাজ্যে সাংগঠনিক ত্রুটি- দুর্বলতা কাটানোর জন্য সাংগঠনিক প্লেনামে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ গণলাইন অনুসরণের মাধ্যমে রূপায়িত করা জরুরি।

প্রশ্ন : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের পার্টির গৃহীত নির্বাচনী কৌশল গভীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। বাম দলগুলি সব আসনে প্রার্থী না দিয়ে ন্যূনতম আসন, যেমন ধরুন ৫০ আসনে প্রার্থী দিয়ে বাকি ১৯৩ টি আসনে মহাজোটকে সমর্থন করা উচিত

ছিল। বামেরা সব আসনে প্রার্থী দিয়ে পরোক্ষে এন ডি এ- কে সাহায্য করলো না কি? মহাজোট নিজের শক্তিতেই এন ডি এ- কে হারিয়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিস্ট ও অত্যাচারী শক্তি সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ১৯৩০-র দশকে উচ্চারিত ডিমিট্রভের কথাগুলি আমরা ভুলে যাব কেন? আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহী।

উত্তর : সম্প্রতি বিশাখাপত্তনমে পার্টির ২১ তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে গৃহীত রাজনৈতিক- রণকৌশলগত লাইনে একটি শক্তিশালী পার্টি গঠন ও বাম ঐক্য শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পার্টি উপলব্ধি করেছে এই গুরুদায়িত্ব প্রতিপালনে পার্টির সামনে প্রধান কর্তব্য হচ্ছে শ্রেণী ও গণআন্দোলন সংগঠিত ও বিস্তৃত করা। এর মধ্য দিয়েই বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

পার্টি কংগ্রেসে এটাও পর্যালোচিত হয়েছে যে, যেসব রাজ্য বা কোনও অংশে অতীতে আমাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকলেও সেসব স্থানে আমাদের দুর্বলতা ক্রমবর্ধমান। দুর্বলতার কারণগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হচ্ছে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের সঙ্গে আমাদের নির্বাচনী গাঁটছড়া বাঁধা, কিংবা সমঝোতা করা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সরকারকে আমরা সমর্থনও জানিয়েছি। তাতে হয়েছেটা কী? আমরা আমাদের শ্রেণীগত পরিচিতি ও পার্টির স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণের উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছি। এইসব আঞ্চলিক দল, বিশেষত যারা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে সরকার গঠন করেছে এবং সরকার গঠনের পর কংগ্রেস ও বিজেপি-র মতোই নয়া উদারনীতি ও জনবিরোধী নীতি রূপায়ণের দায়বদ্ধতা দেখিয়েছে। আমরা তাদের নয়া উদারনীতি ও জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রচার ও কিছু ক্ষেত্রে সংগ্রামও সংগঠিত করেছি। বিহারে আমাদের পার্টির নেতৃত্বে জমির আন্দোলন হয়েছে। আর জে ডি সরকার সংগ্রামরত জনগণের উপর পুলিশি জুলুম চালিয়েছে। জমি দখলের সংগ্রামে বহু কমরেড শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও জনগণের আস্থা আমরা অর্জন করতে পারিনি। জনগণের ক্ষোভ- বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ও তাকে পুঁজি করে বিজেপি লাভবান হয়েছে। বিশেষ করে ২০১৪ সালে শুধু কংগ্রেসেই নয়, জে ডি ইউ এবং আর জে ডি-র বিনিময়েও বিজেপি বড় সাফল্য পেয়েছিল।

এই বাস্তবতার মধ্য দিয়ে সি পি আই (এম) ও বামপন্থীদের দুর্বলতার বিপদ উন্মোচিত হয়েছিল।

পার্টি কংগ্রেসের পর পরই বিহার বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের আগে সি পি আই (এম) রাজ্যের প্রধান বাম দলগুলির সঙ্গে মোর্চা গড়ে তোলে এবং ভূমি বণ্টন, শ্রমিক সংগ্রামের সমর্থনে ও সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে যুক্ত-সংগ্রাম সংগঠিত করে। বাম জোটের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে নির্বাচনী সংগ্রামে এগিয়ে নেওয়া জরুরি ছিল। প্রয়োজন ছিল যাতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যে বুর্জোয়াদের যে জোটই ক্ষমতায় আসুক তার জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামকে শক্তিশালী করা যায়। এ সংগ্রাম পরিচালনায় বামেদের শক্তি ও দক্ষতা বাড়ানো যায়। বামেরাই ভূমি সংস্কার ও ভূমি বণ্টনের দাবি উত্থাপন করে ও সংগ্রাম চালায়। এধরনের ইস্যুই বিহারের জনগণের কল্যাণ ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু আঞ্চলিক দল পরিচালিত সরকারগুলি তার বিরোধিতা করেছে।

কেন্দ্রে বিজেপি-র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ যে দেশের পক্ষে মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করেছে, বিহারেও বিজেপি সরকার গঠনের জন্য সব ধরনের উপায়ই অবলম্বন করবে। এটা পার্টি ও বামেদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। একইসঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া ছিল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করতে একটি শক্তিশালী বাম জোট গঠন অত্যাবশ্যক।

নির্বাচনী প্রচারে বামেরা ও বাম দলের নেতৃবৃন্দ জনগণের ঐক্য ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিপদকে প্রধান বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল এবং এর বিরুদ্ধে জনগণের নিরবচ্ছিন্ন ও আপসহীন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি জনগণের জ্বলন্ত ইস্যু, যেমন ভূমিসংস্কার, মহিলা ও দলিতদের উপর নিপীড়ন, শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান আক্রমণের ঘটনা প্রচারে নিয়ে যেতে বামেরা সক্ষম হয়েছে। এই প্রচারে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ চোখে পড়েছে। কিন্তু প্রচারে বামেদের প্রতি যে জনসমর্থন দেখা গিয়েছিল ভোটে তার প্রতিফলন ঘটেনি। তবে জনগণের স্বার্থে সংগ্রাম করার মতো একটি সংগ্রামী শক্তি আত্মপ্রকাশ করছে, যা তাদের জীবন- জীবিকার সমস্যা নিয়ে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের নিশ্চয়তা দেবে— জনগণের মধ্যে এমন একটি বিশ্বাস তৈরি হতে দেখা গেছে।

ফ্যাসিবাদ মোকাবিলায় ডিমিট্রভের বক্তব্যের অবতারণা এখানে সঠিক হয়নি। ভারতে এখনও ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠেনি। জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা ইস্যুতে দেশের সর্বত্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার এখনও সুযোগ রয়েছে। এই পথেই ফ্যাসিস্টসুলভ

সংঘ পরিবারকে জনবিচ্ছিন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সমস্বরে উচ্চারিত প্রতিবাদ এবং ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘট তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আলাদাভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজেপি- কে পরোক্ষে সাহায্য করা হয়েছে বলে সি পি আই (এম) ও বামেদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা অসত্য ও ভুল। নির্বাচনী ফলাফল কিন্তু আপনার অনুমানকে সঠিক বলতে অক্ষম। সি পি আই (এম-এল) ৩টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি- কে পরাজিত করেই। অন্যদিকে সি পি আই (এম) যে একটি আসনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে সেখানে বিজেপি তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

বামেদের সম্মিলিত প্রাপ্তভোটের হার ৪ শতাংশের কাছাকাছি এবং বাম জোট তিনটি আসনে জয়ী হয়েছে এমন একটি সময়ে যখন জনগণের ব্যাপক অংশ দুটো জোটের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। তিন প্রধান বাম দল, সি পি আই (এম-এল), সি পি আই ও সি পি আই (এম)-র সম্মিলিত প্রাপ্তভোট ১৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৪৯টি। এ থেকে বোঝা যায় বিহারে একটি শক্তিশালী বাম শক্তির উপস্থিতি রয়েছে। ভারতে এমন অনেক রাজ্য নেই, যেখানে এ ধরনের মেরুকরণের পরিস্থিতিতে বামেদের ভোটের হার ৪ শতাংশ হতে পারে।

আমরা মনে করি বিহার নির্বাচনে আর জে ডি - জে ডি ইউ জোটের বিপুল জয়ের মধ্যে দিয়ে জনগণের বড় অংশ বিজেপি-র মতো সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক ঘটনা যা দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবিলায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং একইসঙ্গে নয়া উদারিকরণের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাকে ব্যবহার করে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষার লড়াইয়ের উত্তাল তরঙ্গ তৈরি করতে হবে। সি পি আই (এম) ও বামপন্থীরা সাম্প্রদায়িকতা ও নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন গণসংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে নিজেদের আরও বেশি করে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট থাকবে।

প্রশ্ন: সি পি আই (এম)'র ২১ তম কংগ্রেসের পর্যালোচনায় বলা হয়েছে "আমাদের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার অন্যতম একটি কারণ ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক দলসমূহের

সঙ্গে আমাদের নির্বাচনী আঁতাঁত ও বোঝাপড়ায় আসা। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজস্ব সত্তা ও স্বাধীন ভূমিকার সঙ্গে আপস করেছি। আমরা জনগণের আস্থাভাজন হতে ব্যর্থ হয়েছি।" আমার মনে হচ্ছে, এই মূল্যায়নে ত্রিপুরায় কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসি (সি এফ ডি)'র বকলমে কংগ্রেসেরই একাংশের সঙ্গে ১৯৭৭ সালে আমাদের জোট গঠন এবং ২০০৮ সালে কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাঁত করে আমাদের যে ভিন্নধর্মী ফলাফল হয়েছিল তা বিবেচনায় আনা হয়নি। একই রাজনৈতিক রণকৌশলগত নীতিতে এই বিপরীতমুখী ফলাফলকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

উত্তর: সি পি আই (এম)'র ২১ তম কংগ্রেস বিগত ২৫ বছর যাবৎ পার্টির রাজনৈতিক রণকৌশলগত নীতির পর্যালোচনা করেছে। গত শতাব্দীর নব্বই-র দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন, সারা বিশ্বে উদারবাদী নীতির আগ্রাসী প্রবর্তন ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শক্তিসমূহের ভারসাম্যের পরিবর্তনের ফলে পার্টির রাজনৈতিক রণকৌশলগত নীতির পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এই পর্যালোচনার উপসংহারে একাংশে বলা হয় যে, রাজ্যে রাজ্যে শক্তিশালী আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে আঁতাঁত করার ফলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে পার্টির নিজস্ব নীতিমালা জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠা ব্যাহত হয়। পুঁজিবাদের এই নয়া উদারবাদী জমানায় আঞ্চলিক দলগুলিও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালার পরিবর্তন ঘটায়। বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় বসে এরা নয়া উদারবাদী নীতিই বাস্তবায়ন করে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ নেয়ার জন্য কখনো বিজেপি বা কখনো কংগ্রেস দলের সঙ্গে সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে। কাজেই এই ধরনের দলসমূহের সঙ্গে আঁতাঁত করার ফলে সি পি আই (এম)'র স্বাধীন শ্রেণী অবস্থান অনেকাংশে ম্লান হয়ে পড়ে। এই কারণে পার্টির গণভিত্তিতে চির ধরেছে।

এই প্রেক্ষাপটেই পার্টির উপরোক্ত রাজনৈতিক রণকৌশলগত দলিলে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, পার্টি তৃতীয় বিকল্পকে সামনে রেখে এই সবদলগুলোর সঙ্গে জাতীয়স্তরে কোনরূপ জোট গঠনের উদ্যোগ নেবেনা। অপরদিকে রাজ্যে রাজ্যে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করতে ও পার্টিকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হয় এমন ধরনের জোট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৭৭ সালে ত্রিপুরায় " কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যোসি"র (সি এফ ডি) সঙ্গে পার্টির নির্বাচনী বোঝাপড়ার যে প্রসঙ্গটি আপনি উল্লেখ করেছেন, তার আগেও পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে পার্টির নির্বাচনী বোঝাপড়া হয়েছিল। ষাট ও সত্তরের দশকে মূল কংগ্রেস দল ভেঙে বিভিন্ন রাজ্যে অনেকগুলি আঞ্চলিক দল গজিয়ে উঠে। এইসব দলগুলির সঙ্গে কোন কোন সময় আমাদের দলের নির্বাচনী বোঝাপড়া হয়েছে। কিন্তু তখন পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এইসব আঞ্চলিক দলগুলির বেশিরভাগেরই ভূমিকা ও নীতি ছিল তৎকালীন মূল রাজনৈতিক শক্তি কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে।

আর ২০০৪ সালে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থনের যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করেছেন তা নির্বাচনী আঁতাঁতের ফলে হয়নি। বিজেপি'র মতো একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি কর্তৃক কেন্দ্রে সরকার গঠন প্রতিহত করে দেশে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠিত হোক মূলত এই লক্ষ্যেই ঐ সময় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন উপা সরকারকে পার্টি সমর্থন জানিয়েছিল।

রাজনৈতিক -রণকৌশলগত নীতিমালা কোন স্থায়ী নীতিমালা নয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের শক্তি ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনও পরিবর্তন করা হয়।

প্রশ্ন:-২১ তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক - রণকৌশলে বলা হয়েছে, " রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সি পি আই (এম)-কে নমনীয় কৌশল গ্রহণ করতে হবে।" বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি?

উত্তর:-নমনীয় কৌশল গ্রহণের বিষয়টি ২১- তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে। এর ভিত্তিতেই রাজনৈতিক প্রস্তাবের রাজনৈতিক -রণকৌশলগত লাইনের অংশে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ওই পর্যালোচনা রিপোর্টে জাতীয় স্তরে বাম দলগুলির সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া পার্টিগুলোর সমন্বয়ে তৃতীয় বিকল্পের ধারণা বাতিল করা হয়েছে। সেখানেই এই নমনীয় কৌশলের কথা বলা হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে—" রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে পারে। বুর্জোয়া পার্টিগুলির অভ্যন্তরে এবং পরস্পরের মধ্যে নতুন নতুন দ্বন্দ্ব

দেখা দিতে পারে। এসব দলের মধ্যে ভাঙন ও খন্ডিত গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে নতুন দলের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় পার্টিকে নমনীয় কৌশল গ্রহণ করতে হবে।"

এর অর্থ হচ্ছে, চলতি রণকৌশলগত লাইন অনুসরণের পাশাপাশি পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী নমনীয় কৌশল গ্রহণের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে। বর্তমানে যে সব রাজনৈতিক জোট রয়েছে সেগুলির মধ্যে ভাঙন ধরতে পারে। এসব দলের অভ্যন্তরীণ সংঘাত তীব্রতর হতে পারে। ফলশ্রুতিতে নতুন কোনও রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের নতুন রণকৌশল গ্রহণ, কিংবা চলতি কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সি পি আই (এম) এখন বিশাখাপত্তনম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক -রণকৌশলগত লাইন অনুসরণ করছে। উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে চলতি লাইনের পরিবর্তন, কিংবা পরিমার্জনের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত যাতে কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করতে পারে, সে জন্যই নমনীয় কৌশলের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: ১. এখন যে বলা হচ্ছে " গণলাইন অনুসারী বিপ্লবী পার্টি" গড়ার কথা, সালকিয়া প্লেনাম তো বলেছিল " গণবিপ্লবী পার্টি"-র কথা। এই দুই স্লোগানের মধ্যে পার্থক্য কি?

২. এ- যাবত অ-কথিত, কিংবা বলা হলেও আগে তেমন জোর দেওয়া হয়নি, এবার জোর দেওয়া হচ্ছে — কী এমন নতুন বিষয় রয়েছে এবারের সাংগঠনিক প্রস্তাবে?

উত্তর: ১. সালকিয়া প্লেনাম থেকে গণবিপ্লবী পার্টি গঠনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সালকিয়া প্লেনামের সামনে আশু সমস্যা ছিল পার্টির প্রভাব ও গণআন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে পার্টি সভ্য সংখ্যার অসঙ্গতি দূর করা। তখন জনগণের মধ্যে পার্টির প্রভাব বাড়তির দিকে থাকলেও পার্টির বিকাশে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটছিল না। কলকাতা প্লেনামের সামনে আশু সমস্যাটি ভিন্ন। গত কয়েক বছরে পার্টি সভ্য সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু পার্টির গণপ্রভাব বাড়েনি। তাছাড়া সালকিয়া প্লেনাম কিন্তু পার্টি বাড়াতে গিয়ে গুণমানের সঙ্গে সমঝোতা

করতে বলেনি। পর্যালোচনায় দেখা গেছে পার্টির গণপ্রভাব বাড়ানোর জন্য পার্টি সভ্যদের যে ধরনের গুণগত উৎকর্ষতা থাকা আবশ্যক , বর্তমানে তা নেই। পার্টির গণপ্রভাব না বাড়ার এই কারণটি বিবেচনায় রেখে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলন শক্তিশালী করতে হবে। এটাই কলকাতা প্লেনামের আহ্বান। সেজন্যই পার্টি সভ্যদের গুণগত মান বাড়িয়ে ও পার্টির বিপ্লবী চরিত্র বলিষ্ঠ করে, পার্টির গণপ্রভাব বাড়ানোর প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ করে পার্টির ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, পার্টি সভ্য সংখ্যার নিরিখে পার্টির গণভিত্তির বিস্তৃতি বিচার করা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির গণচরিত্র কেবলমাত্র তার সভ্য সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না। শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্টির গণভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর অর্থ হচ্ছে গণকার্যকলাপের যে- কোনও আহ্বানে কত বেশি মানুষকে আমরা জড়ো করতে পারছি তার বিচার করা। এটাই হবে কমিউনিস্ট পার্টির গণচরিত্র মূল্যায়নের পদ্ধতি। সালকিয়া প্লেনামের গণবিপ্লবী পার্টির ধারণা ভুল নয়। এটা সঠিক-ই। সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচিতে তার উল্লেখ রয়েছে। তবে পার্টি সংগঠনের বর্তমান অবস্থা বিচার করে পার্টি সভ্যদের গুণগত উৎকৃষ্টতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ, পার্টির গণভিত্তি বাড়াতে পার্টি সভ্যদের গুণগতমান বাড়ানো অপরিহার্য। তাই, গণলাইন অনুসরণের উপর কলকাতা প্লেনাম জোর দিয়েছে। প্লেনামে গৃহীত সাংগঠনিক প্রস্তাবে স্লোগান তোলা হয়েছে।—

“ সর্বভারতীয় গণভিত্তিসম্পন্ন শক্তিশালী সি পি আই (এম)

গড়ে তোলো !

গণলাইন অনুসরণকারী এক বিপ্লবী পার্টি গঠনে

অগ্রসর হও !”

২. দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্লেনামে গৃহীত সাংগঠনিক রিপোর্ট ও প্রস্তাব পুরোটা আপনাকে পড়তে হবে। এগুলো ছেপে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রতিদিন গণশক্তি পত্রিকায় উত্তরবঙ্গের চা- বাগানের শ্রমিকদের মৃত্যুর খবর বেরুচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এই মৃত্যুর মিছিল রোধে কোনও ব্যবস্থা নেবে বলে আশা করা যায় না। আমরা কি শুধু সরকারি ব্যর্থতাকেই দায়ী করে যাব? আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই?

তা হলে, আমরা কি পার্টির সব সদস্য ও দরদিদের কাছে অন্তত দু'দিনের নিজ নিজ আয় শ্রমিক বাঁচাও তহবিলে জমা দেওয়ার আহ্বান জানাতে পারি না?

আমরা বলে থাকি আমাদের পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। তা হলে চা শ্রমিকদের বাঁচাতে কেন আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিচ্ছি না?

উত্তর: উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের বাঁচাতে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াবার কথা বলে আপনি ঠিকই করেছেন। সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ চালাচ্ছে। চা শ্রমিক ত্রাণ তহবিলে এ পর্যন্ত ৯,৬২,৩১৮ টাকা জমা পড়েছে।

ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে এবং চা- বাগানগুলোর এলাকা থেকেও ত্রাণ সংগ্রহের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সি আই টি ইউ'র রাজ্য কমিটির হাতে এ পর্যন্ত ৬ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে। তার মধ্যে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে পিপল্‌স রিলিফ কমিটির হাতে। এই কমিটি দুস্থ শ্রমিকদের ত্রাণে কাজ করছে। আর দেড় লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে সি আই টি ইউ অনুমোদিত চা শ্রমিক ইউনিয়নের হাতে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারগুলিকে সরাসরি অর্থ সাহায্য করা যায়। সি আই টি ইউ-র ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীরা এবং ব্যাংক ও বিমা কর্মচারীরা তাদের বেতন বা পেনশনের একাংশ ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন। এল আই সি কমরেডরা চার লক্ষ টাকা এবং ব্যাংকের কমরেডরা দিয়েছেন তিন লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারি কর্মচারি সমন্বয় কমিটি চা শ্রমিকদের জন্য ৮৭২টি ফুড পার্সেল পাঠিয়েছে। চা শ্রমিকদের স্কুল-পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সামগ্রীও তারা সংগ্রহ করে দিয়েছে।

সারা ভারত কৃষক সভার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ত্রাণের জন্য ৩,১৮,০০০ টাকা সংগ্রহ করেছে। এছাড়া সবকয়টি গণতান্ত্রিক সংগঠনও চা শ্রমিকদের ত্রাণে অর্থ সংগ্রহ করেছে।

ত্রিপুরার সি আই টি ইউ অনুমোদিত চা শ্রমিক ইউনিয়ন দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে

উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের ত্রাণে পাঠিয়েছে।

চা শ্রমিকদের অধিকার ও কাজ সুরক্ষিত করার দাবিতে সি আই টি ইউ অনুমোদিত ইউনিয়ন মৌলিক সংগ্রাম চালাচ্ছে। চা শ্রমিকদের সব ইউনিয়ন মিলে একটি যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি বন্ধ বাগান চালু করা এবং শ্রমিকদের মজুরি ও বকেয়া প্রদান নিশ্চিত করার দাবিতে যৌথ সংগ্রাম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি দুঃস্থ বাগানগুলির পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে যৌথ সংগ্রাম কমিটি লাগাতর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : সি পি আই (এম)'র মুখপত্রগুলির জন্য কোন সাধারণ বিজ্ঞাপন নীতি রয়েছে কি? আমরা দেখতে পাই কেন্দ্রে মোদি সরকারের দু'বছর পূর্তিতে তথাকথিত সাফল্য দাবি করে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন পার্টির বিভিন্ন রাজ্যের মুখপত্রে ছাপা হয়েছে, এমন কি এরজন্য পত্রিকার পুরো পৃষ্ঠাও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনগুলির বিষয়বস্তু যা পার্টির মুখপত্রগুলিতে স্থান পেয়েছে, দৈনন্দিন প্রচারে পার্টি বরাবর এগুলি খারিজ করে ও বিরোধিতা করে। সাধারণ পাঠক, যারা পার্টির মতাদর্শের পরিপন্থী কোন বিষয়বস্তু পার্টির মুখপত্রে স্থান পাওয়া দেখতে চায় না, তাদের মধ্যে কি এই ধরনের বিজ্ঞাপন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে না?

উত্তর : পার্টি পরিচালিত দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞাপন গ্রহণ করার বিষয়টি অনেক আগেই চূড়ান্ত হয়েছে। পার্টির দৈনিকসমূহে কেন্দ্র ও রাজ্য দু'ধরনের সরকারি বিজ্ঞাপনই ছেপে থাকে। পার্টির দৈনিকগুলি চালু রাখার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার প্রধান উৎস হল বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্ত আয়। সরকারি বিজ্ঞাপন এই আয়ের একটি বড় অংশ।

পার্টি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মূল নীতিসমূহের তীব্র বিরোধী। শুধু বর্তমান সরকারই নয়, বস্তুত পার্টি পূর্বতন প্রায় সবগুলি কেন্দ্রীয় সরকারেরই বিরোধিতা করে এসেছে। পার্টির এই অবস্থান তাই বলে কোনভাবেই সরকারি বিজ্ঞাপন গ্রহণ না করার পেছনে যুক্তি হতে পারে না। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করার পেছনেও একই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়।

যে কোন সংবাদপত্রের তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিবন্ধ বা ব্যাখ্যামূলক আলোচনায় সরকারি নীতি ও অবস্থানের সমালোচনা করার স্বাধীনতা রয়েছে। পত্রিকার কাজই হলো যে কোন রাজনৈতিক ঘটনাবলি বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা এবং জনমতকে প্রতিফলিত করা। অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞাপন ছাপা মানে এই নয় যে পত্রিকাটি বিজ্ঞাপন প্রদানকারী সরকারের নীতি ও পদক্ষেপসমূহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছে। সংবাদপত্র পাঠকরা সহজেই বিজ্ঞাপন ও পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য টানতে সমর্থ।

যে যুক্তিতে সরকারি বিজ্ঞাপন গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে, তাকে মান্যতা দিলে পরে একই যুক্তিতে আমরা বহুজাতিক কোম্পানি ও বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলির উৎপাদিত পণ্যের বিজ্ঞাপনও গ্রহণ করতে পারি না। যদিও এগুলি হলো পার্টি পরিচালিত দৈনিক পত্রিকাগুলির জন্য সাধারণ বিজ্ঞাপন নীতি, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেমন কোন ধর্মঘট বা সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া কোন বিজ্ঞাপন পত্রিকাগুলি গ্রহণ করবে না। বেসরকারি কোম্পানি থেকে প্রদত্ত এমন কোন বিজ্ঞাপনও পত্রিকাগুলি গ্রহণ করবে না, যাতে শ্রমিক ও কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী বিষয়বস্তু বিজ্ঞাপিত করা হয়।

পার্টির দৈনিকগুলির জন্য উপরোক্ত সাধারণ নীতিমালা গ্রহণযোগ্য হলেও পার্টির মতাদর্শ ও রাজনৈতিক মতামত প্রচারের জন্য প্রকাশিত পার্টির বিভিন্ন সাময়িক পত্রগুলির জন্য ভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন :সি পি আই (এম) কেন সি পি আই (মাওবাদী)- কে বাম ঐক্য মঞ্চে অন্তর্ভুক্ত করছে না? সি পি আই (মাওবাদী) কি বাম দল নয়?

উত্তর: সি পি আই (এম) দেশের সমস্ত বাম দল, বামপন্থী গোষ্ঠী ও বামপন্থী ব্যক্তিবর্গের নিকট একটা বৃহত্তর বাম ঐক্য গঠনের আহ্বান জানিয়েছে। এই ঐক্য গঠনের জন্য সর্বসম্মত ইস্যুতে যুক্ত কার্যক্রম ও যৌথ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় স্তরে ৬টি বামপন্থী দল এই যৌথ সংগ্রামে রাজি হয়েছে। কয়েকটি রাজ্যেও রাজ্যভিত্তিক কিছু বাম দল মিলে সংযুক্ত বাম মোর্চা গঠন করেছে। যেমন, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে ১০টি বাম দলের জোট, ১৭ বাম দল ঐক্যবদ্ধ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, ৮ পার্টির বাম জোট গঠিত হয়েছে মহারাষ্ট্রে।

মাওবাদীরা, যারা নিজেদের সি পি আই (মাওবাদী) বলে পরিচয় দেয়, তারা আত্মগোপনে থেকে তৎপরতা চালাচ্ছে এবং প্রধানত সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনৈতিক রণকৌশল গ্রহণ করেছে। গণরাজনৈতিক কার্যকলাপ কিংবা গণআন্দোলন বিকাশে তারা বিশ্বাসী নয়।

বামপন্থী দলগুলি, বিশেষ করে সি পি আই (এম) ও সি পি আই-র প্রতি তারা শত্রুতামূলক মনোভাব গ্রহণ করে এবং শাসকশ্রেণীগুলির দালাল বলে তাদের আখ্যায়িত করে। প্রকৃতপক্ষে তারা সি পি আই (এম) কর্মী ও সমর্থকদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং অতিসম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল মহলে বহু পার্টি সভ্য ও দরদিদের হত্যা করেছে।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ বাম মঞ্চে মাওবাদীদের শামিল করার কোনও প্রশ্ন নেই। যদি তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও মৌলিক ও আন্তরিক পরিবর্তন ঘটে, কেবল তখনই তাদের বৃহত্তর বাম ঐক্যে শামিল করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : গত ১৯ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'অমর উজালা' পত্রিকার একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল, '' রাজনৈতিক দলগুলি জানে না কারা তাদের অর্থ যোগাচ্ছে।'' সেই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে— ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনের নির্বাচনী হিসাব বিজেপি নির্বাচন কমিশনে জমা-ই দেয়নি। সি পি আই (এম) কেন এ বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করলো না? কেনই বা বিজেপি-র রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি বাতিলের জন্য পার্টি শীর্ষ আদালতে গেল না? ওই রিপোর্টে এও বলা হয়েছে যে,অন্য পাঁচটি জাতীয় রাজনৈতিক দল ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব জমা দিয়েছে। তবে এসব রাজনৈতিক দলের আয়ের ৮০ শতাংশই হিসাব বহির্ভূত। কারণ, চাঁদাদানকারীদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ জানানো হয়নি। এদের মধ্যে আবার কয়েকটি দল রয়েছে যারা বলেছে কুপনের মাধ্যমে তারা অর্থ সংগ্রহ করে। এ বিষয়ে সি পি আই (এম)-র অবস্থান কি?

উত্তর : আসলে ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০১৩ -১৪ আর্থিক বছরের হিসাব বিজেপি নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়নি। আপনি যা বলেছেন এটা অন্য বিষয়। সংসদ নির্বাচনের হিসাব হয়তো বিজেপি জমা দিয়ে দিয়েছে। কারণ এই নিয়ম তাকে মানতেই

হবে।

কিন্তু প্রধান ইস্যু অন্যত্র। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির আয় নিয়ে যে প্রশ্ন সংবাদে উত্থাপন করা হয়েছে এবং যাকে বলা হয়েছে হিসাব বহির্ভূত, এটা হচ্ছে বিতর্কের মূল বিষয়।

'ইলেকশন ওয়াচ' নামের একটি এন জি ও অভিযোগ করেছে, রাজনৈতিক দলগুলি যে আয় দেখিয়েছে তার ৮০ শতাংশ হিসাব বহির্ভূত। কারণ চাঁদাদানকারী ব্যক্তির নামে কাটা রসিদের অংশ জমা দেওয়া হয়নি।

সি পি আই (এম)-র কথা ধরলে সংবাদটি পার্টি সম্পর্কে একটি ভুল বার্তা দিয়েছে। সি পি আই (এম) অন্য দলের মতো নয়। তার আয়ের ৪০ শতাংশ আসে পার্টি সভ্যদের প্রদেয় লেভি থেকে। সাড়ে দশ লক্ষ পার্টি সভ্য নিজ নিজ ইউনিটে মাসিক লেভি জমা দেন। কারা কারা পার্টি সভ্য এবং কার কতো লেভি জমা হয়েছে এটা আমাদের পার্টির অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাই পার্টি সভ্য ও তাদের প্রদেয় লেভি সম্পর্কে পার্টির বাইরে আমরা জানাতে পারি না। কিন্তু এটাকে কোনভাবেই হিসাব বহির্ভূত বলা যায় না। এ ছাড়া বক্স, পতাকায় জনগণ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এটাও ব্যক্তিগতভাবে কে কত দিয়েছেন তার তথ্যও দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এই সংগ্রহে নামে নামে রসিদ দেওয়া হয় না। সংশ্লিষ্ট ইউনিট মোট সংগ্রহের রেকর্ড রাখে।

২০ হাজার টাকা কিংবা তার বেশি চাঁদাদাতার বিস্তৃত তথ্য আইন অনুযায়ী রেকর্ড রাখতে হয়। এ ধরনের আয় সি পি আই (মে)-র মোট আয়ের মাত্র ৩.৩ শতাংশ।

সুতরাং এটা বলা সম্পূর্ণ অসত্য যে পার্টি ভুতুড়ে উৎস থেকে আয় করে।

প্রশ্ন :- চীন, ভিয়েতনাম , উত্তর কোরিয়া, কিউবা প্রভৃতি দেশে ইতোমধ্যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সাধারণভাবে এইসব দেশকে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় এবং তাদেরকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়। আমি যদ্দুর জানি, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল এবং একমাত্র এই দেশেই শ্রেণী শোষণ ও সামাজিক শোষণের অবসান ঘটেছিল। বিশ্বের অন্য কোন দেশ এখনও এই সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

আমার মনে হয় আমার অনুমান সঠিক। যদি তাই হয় তাহলে এই দেশগুলিকে কি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মেলানো উচিত কিংবা তাদেরকে সমাজতান্ত্রিক দেশ বলা উচিত?

উত্তর:- এটা ঠিক যে সোভিয়েত ইউনিয়নেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল। তবে সমাজতন্ত্র নির্মাণের লক্ষ্যে অন্যান্য দেশগুলি বিপ্লব সম্পন্ন করেনি—এ কথা বলাটা ভুল হবে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করতে হবে। রাশিয়া কিন্তু উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল না। ওখানে আধা সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। সোভিয়েত মডেল অনুযায়ী এরা একইসঙ্গে পুঁজিবাদ ও প্রাক পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কগুলির অবসান ঘটাতে পেরেছিল এবং সমাজতন্ত্রের ভিত্তি তৈরি করেছিল। সোভিয়েতে উৎপাদনের উপকরণগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং কৃষিতে যৌথ খামার ব্যবস্থা চালু হয়। খুব দ্রুত গতিতে ওখানে শিল্পায়ন হয়। কারণও ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আক্রমণ ও সোভিয়েতকে চারদিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী অবরোধের মুখে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী করতে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজন ছিল।

যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তার জন্য সমাজতন্ত্র নির্মাণের সোভিয়েত মডেলকেই দীর্ঘ সময় ধরে অনুসরণের কথা বিবেচিত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সব দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ এক হতে পারে না। চীন, কিউবা ও ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

পশ্চিম গোলার্ধে প্রথম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় কিউবায়। কঠিন সংগ্রাম করে কিউবা এমন একটি নতুন সমাজ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে যেখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত। সেখানে বর্ণবিদ্বেষ ও লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটেছে। সোভিয়েত মডেল অনুসৃত হয়নি বলে কিউবাকে সমাজতান্ত্রিক দেশ না — বলাটা ভুল হবে।

কীভাবে সমাজতন্ত্র নির্মাণে অগ্রসর হতে হবে তার জন্য কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্প নেই। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রাম। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লবের পর লেনিন বলেছিলেন, "আমরা পুঁজিবাদ অবসানের ক্ষেত্রে মাত্র প্রথম কাজটি করলাম এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে পা বাড়িয়েছি। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য ভবিষ্যতে আমাদের কত সিঁড়ি ভাঙতে হবে তা আমরা জানি না এবং তা জানতে পারিও না।"

প্রশ্ন:- এটা কি সত্যি নয় যে ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষকরা বিশেষ করে কমিউনিস্টরা, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলিমদের অধিকার নিয়ে বেশি মাতামাতি করছেন?

উত্তর :- আমাদের দেশে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর থেকে বারেবারে এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। সংবিধান গ্রহণের সময়ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের চরিত্র কী হবে— এ নিয়ে বিতর্ক ছিল। সবেমাত্র দেশ ভাগ হয়েছে। এ সময়ে হিন্দু মহাসভা ও আর এস এস-র মতো অনেকে বিশ্বাস করতো, মুসলিম লিগ যেহেতু আলাদা রাষ্ট্রের দাবি করেছে এবং মুসলিমদের মাতৃভূমি হিসাবে পাকিস্তান গঠিত হয়েছে, সে কারণে ভারত নিজেকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করুক এবং সেই অনুযায়ী জনসংখ্যার 'হস্তান্তর' ঘটুক। এটা তারা শুধু বিশ্বাসই করতেন না, এই চিন্তার সপক্ষে তারা প্রচারও চালিয়েছেন।

এই যুক্তিটি আজকের সময়ে বারেবারে শোনা যাচ্ছে। এটা যেন খুবই যুক্তিগ্রাহ্য! আসলে এটা মূল সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। সমাজের সব অংশের মধ্যে এবং আইন প্রণেতাদের মধ্যে প্রচুর আলোচনা চলছিল— গণতন্ত্র শক্তিশালী করা ও সব অংশের জনগণের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য এবং মানবাধিকার শুধু নয় শিক্ষা, পেশা, বিবাহ নিজ নিজ পছন্দমতো বেছে নেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে কী ধরনের সমাজ গঠন করা উচিত। এটাও আলোচনা চলছিল সকলের জন্য স্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি কোন্ পথে নিশ্চিত করা যাবে। পরিশেষে এই উপসংহার টানা হয় যে, প্রকৃত গণতন্ত্র, সকলের সমৃদ্ধি ও ধর্মনিরপেক্ষতাই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একটি ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে কারা এই ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের বিরুদ্ধে এবং কারা এর পরিবর্তন সাধন করতে চায়।

১৯৫০ সালে ভারতে যখন ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হয় এবং সেখানে শুধু সংখ্যালঘুদেরই নয়, যারা যুগ যুগ ধরে সামাজিক বৈষম্যের শিকার, সেই তপশিলী জাতিভুক্ত জনগণের অধিকার রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

আর এস এস নেতা গোলওয়ালকার 'অর্গানাইজার' পত্রিকায় লিখলেন— "আমাদের সংবিধানে প্রাচীন ভারতের চমৎকার সাংবিধানিক বিবর্তন ও মনু আইনের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়নি....আজ পর্যন্ত মনু স্মৃতি সারা বিশ্বে বন্দিত হচ্ছে। অথচ আমাদের

সংবিধান পণ্ডিতগণের মতে এসব নাকি কিছুই না!" এ বক্তব্য থেকে এটা খুব পরিষ্কার যে আর এস এস যখন ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘুদের বিশেষ অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধাচরণ করেছে (আজও করে যাচ্ছে), তখন তাদের ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সংবিধান বদল করে হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা ধর্মীয় অনুশাসনের বন্ধনে আবদ্ধ সামাজিক ও লিঙ্গ বৈষম্যকেই অটুট রাখতে চায়। তারা যখন প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সংখ্যালঘু অধিকারের উপর আক্রমণ শানায় (আজও তা অব্যাহত), তখন তারা এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যেখানে হিন্দুদের অধিকাংশের (শুদ্র, দলিত, নারী) ন্যায্য অধিকার থাকবে না, যা কিনা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান তাদের দিতে চেয়েছে। তারা জানে তারা যে ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তার প্রকৃত চরিত্র যদি মানুষ ধরে ফেলে তাহলে সকলে তা বাতিল করে দেবে।

আজকের দিনে আমাদের দেশে আর এস এস -হিন্দুত্ববাদী শক্তিসমূহ আগের তুলনায় শক্তি বাড়িয়েছে। সুসংগঠিত সংঘ পরিবারের অনেকগুলো শাখা রয়েছে। যেমন, বিজেপি হচ্ছে তার রাজনৈতিক শাখা এবং রয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরঙ দল, দুর্গা বাহিনী প্রভৃতি।

অন্যদিকে, কমিউনিস্টরা ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় এবং বিভিন্ন অংশের ব্যাপক জনগণের মধ্যে শ্রেণীগতভাবে বৃহত্তর ঐক্য শক্তিশালী করার সংগ্রামে সামনের সারিতে রয়েছে এবং তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটা কমিউনিস্টরা ধারাবাহিকভাবে করে যাচ্ছে শুধু তা নয়, তারা সব ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধেও নিরন্তর লড়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্টরা এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা অন্য সাম্প্রদায়িকতাকেও শক্তিশালী হতে সাহায্য করে।

শাহ্‌বানু বিতর্কের সময় সি পি আই (এম) -ই একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা সংসদের ভেতরে ও বাইরে একটি নীতিনিষ্ঠ অবস্থান নিয়েছিল। আমরা দাবি করেছি মুসলিম মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদের পর খরপোষের আইনিধারার বাইরে তাদের রাখা যাবে না। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা মুসলিম মহিলাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং সি পি আই (এম) এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বরাবর অবস্থান নিয়েছে।

সাম্প্রদায়িক শক্তির এই ভীতিপ্রদ উত্থানের ফল কী হতে পারে সি পি আই (এম) -র কাছে তা স্পষ্ট। তার ফলে শোষিত শ্রেণীগুলির একতা ও তাদের সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত

হবে। একই সময়ে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক জনগণ এবং সব অংশের গরিবদের উপর নয়া উদারিকরণের খাঁড়া নেমে এসেছে। আমরা এটা জানি যে এসব আক্রমণ ঠেকাতে শ্রমজীবী জনগণের জঙ্গি একতা গড়ে তুলতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ ও সাম্প্রদায়িক প্রচার সংগঠিত করে ঐক্য গঠনের কাজটিকে কঠিন করে তুলছে।

সি পি আই (এম) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির উত্থান শুধু সংখ্যালঘুদের জন্যই বিপজ্জনক নয়, এটা দলিত , উপজাতি, শ্রমিক, কৃষক ও নারীদের জন্যও বিপদের কারণ । বিপদের কারণ তাদের জন্যও যারা স্বৈরতন্ত্র ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরোধিতা করছেন। এ দিকটি বড় অংশের জনগণের সামনে যাতে উন্মোচিত না হয় তার জন্য সংঘ পরিবার দুটো কৌশল নিয়েছে। একদিকে তারা ঘৃণা ছড়াচ্ছে, অন্যদিকে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এর বিরোধিতা করছেন সংখ্যাগুরুদের একটি অংশও । তাদের ' হিন্দু বিরোধী' বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এই বিপদ উন্মোচনে আমাদের প্রচার আরও বাড়াতে হবে। শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের মধ্যে হিন্দু রাষ্ট্রের আসল চরিত্র আরও বেশি করে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি দলিত, উপজাতি, নারী ও সংগ্রামরত শ্রমজীবী জনগণের উপর যে কোনও আক্রমণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

এমন একটা সময়ে আমরা এসে পৌঁছেছি, যেখানে শ্রমজীবীদের যাবতীয় অর্জিত অধিকার ও মৌলিক অধিকার আক্রান্ত, যখন বেকারি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম আকাশছোঁয়া, সে সময়ে সংঘ পরিবার ও তার হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে এবং তাদের নীতিতে বিপর্যস্ত সকলকে সংগ্রামে শামিল করার উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রশ্নঃ:- নেপালের সংবিধান নিয়ে ভারত সরকারের অবস্থানকে কেন সি পি আই (এম) সমালোচনা করেছে। মাধেসী সম্প্রদায়ের প্রতি যে অবিচার হয়েছে তাতে কি ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়াটা অন্যায় ? তরাই অঞ্চলে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে তার সমাধান কীভাবে সম্ভব ?

উত্তর:- নেপালের নতুন সংবিধানকে সি পি আই (এম) স্বাগত জানিয়েছে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নেপালের জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের পর এবং সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া

হোঁচট খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত নেপালের নির্বাচিত গণপরিষদ একটি গণতান্ত্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়, ধর্মনিরপেক্ষ ও সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করেছে। নির্বাচিত গণপরিষদ জনগণের সব অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ভারতীয় সংবিধান যে গণপরিষদ গ্রহণ করেছিল তা নির্বাচিত হয়েছিল সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে।

নেপালের সংবিধানের অনেকগুলি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এটা সবচেয়ে উন্নত। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, মহিলা- দলিত-জনজাতি ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মৌলিক অধিকার সংবলিত অংশটি ভারতীয় সংবিধানের তুলনায় অধিক সুসংহত। নেপালের সংবিধানে সাতটি প্রদেশের সংস্থান রাখা হয়েছে। মাধেসীদের জন্য একটি আলাদা প্রদেশ না করায় এই সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়।

মোদি সরকারের অবস্থান একেবারেই অযাচিত। একটি সার্বভৌম দেশের সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়ায় কি আরেক দেশ হস্তক্ষেপ করতে পারে? গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর মোদি ভারত সরকারের বিদেশ সচিবকে নেপাল পাঠালেন। নেপালের সংবিধান কার্যকর হওয়া আটকাতে ভারত সরকারের চেষ্টা অবাঞ্ছিত ও অন্যায় হস্তক্ষেপের শামিল। ভারত সরকার তার অসন্তুষ্টির কথা জানায়।

মোদি সরকার মাধেসী সম্প্রদায়ের আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন ও সহানুভূতি জানিয়েছে। সীমান্তে রাস্তা রোকো চলছিল। পণ্য সরবরাহ বন্ধ করা হয়। ভারতের দিক থেকে এই অবরোধের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। নেপাল চারদিক থেকে পাহাড়বেষ্টিত ভূখণ্ড এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় ভারতের সড়ক যোগাযোগের উপর।

ভারত সরকার অত্যন্ত সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। এটা করা হয়েছে বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র নির্বাচনী ফায়দা তোলার জন্য। নেপালের সীমান্তবর্তী বিহারের জেলাগুলির জনগণের সঙ্গে সীমান্তের ওপারের জনগণের গভীর পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে। খবর পাওয়া গেছে, বিজেপি সমর্থক ব্যবসায়ী ও দলীয় নেতারা সীমান্তের ওপারের অবরোধকারীদের অর্থ ও খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।

মোদি সরকারের এই নেতিবাচক অবস্থান পরিত্যাগ করতে হবে। সীমান্ত যাতে শান্ত থাকে, যাতে পণ্য চলাচল স্বাভাবিক হয় তার জন্য ভারতের দিক থেকে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে।

মাধেসী সম্প্রদায়ের সমস্যার প্রতি নেপালের সরকার ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির অবিলম্বে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাদের জন্য নতুন প্রদেশ তৈরির সাংবিধানিক সুযোগ তৈরি করে সমস্যাটির সুষ্ঠু ও ন্যায্য রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। তাতে মাধেসী ও থারুদের ক্ষোভ প্রশমিত করা সম্ভব হতে পারে।

ভারতের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী নেপালের প্রতি ভারতের দাদাগিরিসুলভ আচরণ বিজেপি'র হিন্দুজাতীয়তাবাদী মনোভাবেরই প্রতিফলন। নেপাল হিন্দুরাষ্ট্র না হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষিত হওয়ায় আর এস এস ও বিজেপি দারুণ খ্যাপা।

প্রশ্ন:- এন এস সি এন (আই এম)'র সঙ্গে "নাগালিম" গঠন নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে না কি প্রধানমন্ত্রী মোদি সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন? "নাগালিম"— এ না কি আসাম, অরুণাচল প্রদেশ ও মণিপুরের অংশ অন্তর্ভুক্ত হবে? মোদির এই উদ্যোগ কি গোর্খাল্যান্ড, খালিস্তান, সৌরাষ্ট্রম ইত্যাদির মতো জনজাতিভিত্তিক আলাদা রাজ্যের দাবিকে উৎসাহিত করবে না?

উত্তর:- কয়েক সপ্তাহ আগে কথাটি শোনা গিয়েছিল। কিন্তু মোদির 'ঐতিহাসিক চুক্তি' পরবর্তী সময়ে অন্য নামে অভিহিত হয়। এটাকে বলা হয়েছে 'আলোচ্য বিষয় নিয়ে চুক্তি'। কোন্ কোন্ বিষয়ে ওদের মধ্যে এই চুক্তি হয়েছে, তা এখনও প্রকাশ পায়নি। আজ পর্যন্ত বিষয়টি জনগণের আগোচরেই রয়ে গেছে। কিন্তু, কিছু না বলে দীর্ঘকাল তো চুপ করে থাকা যায় না। এটা স্পষ্টভাবে বলা দরকার যে, এ ধরনের চুক্তির আগে প্রধানমন্ত্রী কোনও রাজনৈতিক দল কিংবা নেতার সঙ্গে আলোচনা করেননি। অবশ্য, তার নিজের দল বিজেপি ও বিজেপি-র নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলতেই পারেন। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা থেকে মনে হয়েছে তিনিও সবটা জানেন না।

দ্বিতীয়ত, এটা নয় যে একটি নতুন রাজ্য গঠনের কথা উঠেছে। নাগাল্যান্ড একটি পূর্ণ রাজ্য এবং সেখানে একটি নির্বাচিত সরকার রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন নাগা গোষ্ঠীর নানা বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এগুলির কোনও সমাধান হয়নি। এন এস সি এন (আই এম) সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী হলেও একেই শুধুমাত্র আলোচনার টেবিলে ডাকা হয়েছে।

নাগা আন্দোলনের সবচেয়ে বিতর্কমূলক দাবি হচ্ছে, মণিপুর ও অরুণাচলের

সীমান্তবর্তী লাগাতর নাগা অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে নিয়ে "নাগালিম" নামের নতুন রাজ্য গঠন করতে হবে। অবশ্য মণিপুর ও অরুণাচল এ দাবির তীব্র বিরোধিতা করেছে। এটা ঘটনা যে, নাগা অধ্যুষিত এইসব এলাকায় বহু সংখ্যক সংখ্যালঘুর বসবাস রয়েছে— মণিপরি, অরুণাচলী, বিহারি, উত্তরপ্রদেশের লোকজন প্রভৃতি। যখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখন শোনা গিয়েছিল এন এস সি এম (আই এম) সম্ভবত "নাগালিম"- র দাবি পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু দু'সপ্তাহ পরই এন এস সি এম (আই-এম) এর নেতা মুইভা " নাগালিম" এর পতাকা উত্তোলন করে বললেন " নাগালিম" এর দাবি ছেড়ে দেওয়া কখনও সম্ভব নয়।

সুতরাং আসলে কী হয়েছে তা খুব স্পষ্ট নয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয়েছে কিংবা আসলে কোনও চুক্তি হয়েছে কী না এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও তমসাচ্ছন্ন। অনেক অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের মতে প্রধানমন্ত্রী যা-ই বলুন, আলোচনায় আসলে তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। এর অর্থ এই নয় যে, নাগা সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন নেই। নাগা সমস্যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সন্ত্রাসী তৎপরতা, হিংসা, সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও নাগা মহিলাদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের দীর্ঘ ইতিহাস।

এখন প্রয়োজন হচ্ছে পূর্বোত্তরের জনজাতিগত বিদ্বেষ ও সংঘাতের অবসান ঘটানোর মানবিক আবেদন জানানো। এ অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতাদের ও রাজ্য সরকারগুলির প্রতিনিধিদের একসঙ্গে বসে জনগণও রাজ্যগুলিকে প্রভাবিত করে বা করতে পারে, এমন সব ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

পরিশেষে এটা বলা যায় পুরো বিষয় না জানলেও নাগা সমস্যা নিয়ে কোনও চুক্তি হয়েছে বলে মনে হয় না। সংঘাত অবসানে কোনও পদক্ষেপ গৃহীত হলে তাকে স্বাগত জানাতে হবে। তবে স্পর্শকাতর ও জটিল এসব সমস্যার একতরফা ও অগণতান্ত্রিক উপায়ে সমাধানের চেষ্টা তেমন কোনও ইতিবাচক ফল দেবে না।

প্রশ্ন: সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যক বেঞ্চ ভারত সরকারের নিকট জানতে চেয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নে সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে। এটা কি সঠিক অভিমুখে এগোনো নয়? সি পি আই (এম)-র বক্তব্য জানতে চাই।

উঃ সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে এই প্রথম বলছে না, বিভিন্ন সময়ে ও মামলায় আদালত এই প্রশ্নের অবতারণা করেছে। এখন একজন খ্রিস্টান ভদ্রলোকের বিবাহ

বিচ্ছেদের মামলায় প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপিত হয়েছে। আবেদনকারীর বক্তব্য বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য হিন্দুদের ক্ষেত্রে যদি অপেক্ষার সময়সীমা এক বছর হয় তবে তার ক্ষেত্রে দু'বছর হবে কেন? অপেক্ষার সময়কাল তার ক্ষেত্রেও এক বছর করা হোক। এর আগে একজন স্বামী পরিত্যক্তা হিন্দু মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে যান এবং বলেন যে তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার বিয়েও করেন। মহিলা সেই স্বামীর বিরুদ্ধে সুবিচার পেতে শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হন। তখনও শীর্ষ আদালত এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। এসব মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়দানে কোনও বাধা ছিল না। দ্বিতীয় বিয়ের জন্য ধর্মান্তর নিষিদ্ধ এবং এ রকম হলে তাকে ধর্মান্তর বলে বিবেচনা করা হয় না। খ্রিস্টান ভদ্রলোকের বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অপেক্ষার সময়সীমা কমিয়ে এক বছর করাই যেত। এর জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। অতীতে এ ধরনের বহু সিদ্ধান্ত শীর্ষ আদালত নিয়েছেও। একজন মুসলিম মহিলার খরপোষের দাবির পক্ষে এবং প্রথমা স্ত্রীর বর্তমানে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের বিরুদ্ধে এই আদালতই রায় দিয়েছিল। এসব ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রতি বামপন্থীরা এবং মহিলা সংগঠনগুলি বরাবর সমর্থন জানিয়েছে। রক্ষণশীলদের দিক থেকেও তেমন কোনও উচ্চবাচ্য পরিলক্ষিত হয়নি।

এটা ঘটনা যে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত আইনের (পারসোনাল ল) অনেক ধারা লিঙ্গ -সমতার পক্ষে নয় এবং উত্তরাধিকার, সন্তান পালন, সন্তানের অভিভাবকত্ব, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি নানান প্রশ্নে এই ধারাগুলি মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিষয়টিকে অনেক সময় সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে মুসলিমদের মহিলা বিরোধী আখ্যা দিতে ব্যবহৃত হয়। বিষয়টি সম্যক বোঝার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে লিঙ্গ সমতার জন্য সংগ্রামের ইতিহাস যেমন জানা দরকার, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে উত্থাপিত লিঙ্গ সমতার দাবির প্রতি সমসাময়িক সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গিও বিবেচনা করতে হবে।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব, সন্তান লালন, বিবাহ বিচ্ছেদ, বৈধব্য, শিশু বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দু মহিলারা যে অবিচারের সম্মুখীন হয় তা দূর করতে গণপরিষদ ও সংসদে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। সেই সময় হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘের সদস্যরা তথাকথিত ধর্মভিত্তিক হিন্দু আইনের যে-কোনও পরিবর্তনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল। এরাই এখন অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মুখ্য দাবিদার ও প্রবক্তা। বহু বছরের চেষ্টায় বিক্ষিপ্ত কিছু

সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং হিন্দু মহিলাদের উত্তরাধিকারস্বত্ব মাত্র বছর দশেক আগে আদায় হয়েছে। আইনের কিছু সংশোধন হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু মহিলারা এখনও বাস্তবে অবিচারের শিকার। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত শিশু বিবাহের প্রথা আজও বিদ্যমান। পণপ্রথা আজকের সময়ের সবচেয়ে বড় সামাজিক সমস্যা হলেও এটাকে লঘু অপরাধ বলেই চিহ্নিত করা হচ্ছে।

লিঙ্গ সমতার জন্য সংগ্রাম দীর্ঘমেয়াদি এবং কঠিনও বটে। এমনকি আইনের পরিবর্তন ঘটালেও তা বই পুস্তকেই থেকে যাচ্ছে, বাস্তবে তার প্রয়োগ নেই।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির স্লোগান যা কিনা অহিন্দু মহিলাদের প্রতি অবিচারের প্রসঙ্গেই উত্থাপিত হয়, এটা আসলে একটা যাজকীয় ঘোষণা মাত্র এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের মহিলারা ন্যায়ের দাবিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন সংগ্রাম জারি রেখেছে তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া ও সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের রক্ষণশীলদের এই সংগ্রামের বিরোধিতা করার এক হাতিয়ারে পর্যবসিত হয়।

কয়েক দশক আগে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বহু নারী ও পুরুষ একাংশের ধর্মগুরুদের সহায়তায় খ্রিস্টান আইনের একটি খসড়া সংশোধনী তৈরি করেছিল। কারণ খ্রিস্টান আইনে মহিলারা বৈষম্যের শিকার ছিল। এই আন্দোলনের প্রতি খ্রিস্টান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন সত্ত্বেও ওই সম্প্রদায়ের মৌলবাদীদের সঙ্গে আপষ করে সরকার নারী সাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেনি কিংবা করতে চায়নি। এই আইনের ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

তেমনিভাবে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মতো অনেক মহিলা সংগঠন এবং ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলনের মতো সাহসী মুসলিম মহিলা সংগঠনগুলি মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিগত আইন সংশোধনের জন্য প্রচার চালিয়ে আসছে। এক বসাতেই একতরফা তালাক দেওয়া, বহু বিবাহ প্রথা, অভিভাবকত্বের অধিকারহীনতা ইত্যাদি প্রশ্নে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। এসব ধারা পরিবর্তনের দাবিতে লক্ষ লক্ষ মুসলিম মহিলার স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে কয়েকবার এবং এগুলি সরকারের কাছে জমাও দেওয়া হয়েছে। সরকার এগুলির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করেনি। সম্প্রতি ভারতীয় মুসলিম মহিলা সমিতি মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক ধারাগুলি পরিবর্তনের জন্য একটা ব্যাপক প্রচারাভিযান সংগঠিত

করেছে এবং সংশোধনীর একটি খসড়া প্রকাশ করেছে। কিন্তু এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে সরকার কোনও আগ্রহ দেখায়নি।

আদালতের দিক থেকে যদি এ সব উদ্যোগের স্বীকৃতি আসে, তা হলে লিঙ্গ ইস্যুতে সংগ্রামরত মানুষগুলোর শক্তি ও সাহস আরও বাড়তে পারে।

আজকের পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ব্যাপক চেষ্টা চলেছে এবং সংখ্যালঘুদের উপর,বিশেষ করে মুসলিমদের উপর আক্রমণের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। সেই সময়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির স্লোগান , যা বরাবর রণংদেহী আওয়াজে পরিণত হয়, তা কেবলমাত্র নারী অধিকারের বিরুদ্ধেই যাবে। কারণ এ ধরনের আওয়াজ তোলার ফলে ধর্মীয় গোঁড়া ও রক্ষণশীলরা সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশকে তাদের পেছনে জড়ো করার সুবিধা পাবে। এরা কোনওভাবেই নারী অধিকারের পক্ষে দাঁড়াবে না। ফলে লিঙ্গ-সাম্যের ইস্যুটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে।

এর অর্থ কি এই যে নারী অধিকারের জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করতে হবে? মোটেই না। আরও বেশি বেশি করে লিঙ্গ- সাম্য সৃষ্টিকারী ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে। গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন এবং কর্মস্থলে যৌন নির্যাতন নিরোধক আইন দুইটি সাম্প্রতিক উদাহরণ। এই দুটি আইন সব সম্প্রদায়ের মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষায় কার্যকরী হতে পারে। অবশ্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি এসব আইন রূপায়ণে খুব একটা বেশি কিছু করেছে তা বলা যায় না। বিভিন্ন রাজ্যে এসব আইন রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে। এটাও সত্যি যে নির্ভয়া ঘটনায় ভার্মা কমিশন আইনের যেসব সংশোধনীর সুপারিশ করেছিল, তার অনেকগুলিই সংসদে গ্রাহ্য হয়নি। যেমন, সুপারিশ করা হয়েছিল নিজের স্ত্রীর অমতে জবরদস্তিমূলক ধর্ষণ আদালতে গ্রাহ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। এই সুপারিশ গ্রাহ্য না হলেও উন্নততর একটি আইন তৈরি হয়েছে।

তথাকথিত 'সম্মান রক্ষা'র নামে সংগঠিত অপরাধগুলি রুখতে একটি সুসংহত আইনের জন্য যে লড়াই হচ্ছে, সি পি আই (এম) তার প্রতি সমর্থন জানায়। সারা ভারত মহিলা সমিতি ও মহিলাদের জাতীয় সমন্বয় সংস্থা এ বিষয়ে আইনের একটি খসড়া কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এটা করতে অস্বীকার করছে। কারণ চরম পশ্চাদ্‌মুখী এই শক্তিগুলি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর

সহায়ক ও বিভিন্ন ইস্যুতে এরা সমদৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। সংবিধান ও আইন স্বীকার করলেও নিজে পছন্দ করে বিয়ে করা, অন্য জাত ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন তৈরির এরা ঘোর বিরোধী।

সি পি আই (এম) সব ক্ষেত্রে নারীদের সমর্থন দিতে সমান অধিকারের সংগ্রামের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অল্প কয়েকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সি পি আই (এম) অন্যতম একটি দল যারা শাহবানু মামলায় শীর্ষ আদালতের রায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এই দলের রাজ্য শাখাগুলি জাতপাত- সাম্প্রদায়িকতা ও সম্মান রক্ষার নামে অপরাধসমূহের বিরুদ্ধে এবং নারীদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামনের সারিতে রয়েছে। একই সঙ্গে সি পি আই (এম) মনে করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আওয়াজ সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ত্বরান্বিত করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এটা লিঙ্গ- বৈষম্যের অবসান ঘটাবে না। যারা অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথা জোর গলায় বলছে সেই হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি, তারা কি বলতে পারে, কিংবা বলার জন্য তৈরি যে এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে কী কী থাকা উচিত , কী কী থাকবে? কীভাবে এর বাস্তবায়ন করা যাবে এবং শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নয়, উপজাতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এর প্রয়োগ নিয়ে তারা ভেবে কথা বলছে তো? জনজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার বিয়ের প্রথা, বিবাহ বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকারের প্রথা আলাদা আলাদা। এবং এগুলি তাদের আবেগের সঙ্গে মিশে আছে। এসবের মধ্যে অনেক প্রথা রয়েছে যেগুলো বর্তমান আইনের চেয়ে অধিক প্রগতিশীল।

সি পি আই (এম) সব সম্প্রদায়ের জন্য কার্যকরী লিঙ্গ - সাম্যের নিশ্চয়তা বিধানকারী একটি আইন প্রণয়ন ও তার আন্তরিক রূপায়ণকে স্বাগত ও সমর্থন জানাতে প্রস্তুত রয়েছে।

প্রশ্ন: সংসদে প্রস্তাবিত নাবালক বিচার বিল সম্পর্কে সি পি আই (এম)'র অবস্থান কি?

অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালক বিচার আইনের সংশোধনী বিল, যাতে নাবালকত্বের উর্দ্ধসীমা ১৮ বছর থেকে কমিয়ে ১৬ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে, সি পি আই (এম) এর বিরোধিতা করে। বিলের অন্যান্য প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আমাদের কোন বিরোধিতা নেই।

প্রথমেই যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল বর্তমানে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচার চলছে যে যদি এই সংশোধনীটি সময়মত সংসদে পাশ করানো হত, তবে নির্ভয়া গণধর্ষণ মামলায় অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিযুক্তের এত সহজে মুক্তিলাভ ঘটত না।

না, সি পি আই (এম) এই প্রচারে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত নয়। এই প্রচার সর্বৈব মিথ্যা। যেহেতু এই আইনের কোন সংশোধনী আগের কোন মামলার সময়কাল থেকে কার্যকর করা সম্ভব নয়, তাই নির্ভয়া মামলার ক্ষেত্রে এই সংশোধনী কোনভাবেই কার্যকর হবার নয়।

যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সি পি আই (এম) নাবালকত্বের বয়সসীমা ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ করার বিরোধিতা করছে তা হল— রাষ্ট্রসংঘের শিশু অধিকার সনদে উল্লেখিত নাবালকত্বের ১৮ বছর বয়সসীমা। রাষ্ট্রসংঘের এই সিদ্ধান্ত ১৯৯২ সালে ভারত গ্রহণ করে এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে ২০০০ সালে নাবালক বিচার আইন সংশোধন করে নাবালকত্বের বয়সসীমা ১৬ থেকে ১৮ করা হয়। এই সংশোধনীর সংশোধন করে নাবলকত্বের বয়সসীমা পূনরায় ১৬তে কমিয়ে আনার ৮ জন আবেদন করে। আবেদনের উপর রায়ে সুপ্রীম কোর্ট নাবালকত্বের বয়সসীমা ১৮ই বজায় রাখে এবং আবেদনটি বাতিল করে।

এমন কি , দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী নির্ভয়া গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পর নাবালক বিচার আইনের সংশোধনের সুপারিশ চেয়ে গঠিত ভার্মা কমিশনও তার সুপারিশে জোরালো ভাবেই নাবালকত্বের বয়সসীমা কমানোর বিরোধিতা করেছে।

ভার্মা কমিশন তার এই সুপারিশ করে— দেশব্যাপী নাবলকত্বের বয়সসীমা কমানোর আলোড়ন তোলা সংবেদনশীল প্রচারের আবহেই। এমনকি সংসদের স্থায়ী কমিটিও এই আইনের সংশোধনীটি পরীক্ষা করে সর্বসম্মতভাবে নাবালকত্বের বয়সসীমা কমানোর প্রস্তাব সংবিধান বিরোধী বলে মন্তব্য করছে।

যে বৈজ্ঞানিক কারণে রাষ্ট্রসংঘ নাবালকত্বের বয়সসীমা ১৮ বছর নির্ধারিত করেছে তা হল— বয়ঃসন্ধি কালে মানব দেহের- গঠনতান্ত্রিক বিভিন্ন গবেষণাপত্র স্পষ্টতই দেখা দেছে, " মানব মস্তিষ্কের যে অংশ দূরদৃষ্টিগত ভাবনা চিন্তাকে , উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোন ধরনের চাপ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, তা ১৮ বছরের আগে সম্পূর্ণ

হয় না। একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, নাবালকরা নিজেরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এটা তাদের কোন বিকারজনিত রোগ বা দৈহিক বিকলতা নয়।" ২০১৪ সালে সুপ্রীম কোর্টের রায়েও উপরোক্ত মন্তব্যই উদ্ধৃত করা হয়েছে। তবে এখানে এটাও বলা দরকার যে এই তথ্যের অবতারণা করে নাবালকদের অপরাধের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো হচ্ছে না। বরং এর মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে। নাবালকদের জন্য আলাদা অপরাধ আইনের মূল উদ্দেশ্যই হল সাবালক অপরাধীদের সঙ্গে নাবালক অপরাধীদের একই মানদণ্ডে বিচার না করে তাদের সংশোধনের বেশি সুযোগ দেয়া।

এই বলে একটি যুক্তির অবতারনা করা হচ্ছে যে, যেহেতু নাবালক অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তাই এর প্রতিরোধে আরও কঠোর আইন প্রয়োজন। এটা ঠিক নাবালক অপরাধের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু সমগ্র অপরাধ পরিসংখ্যানের এটি একটি মাত্র দিক। ভারতে সামগ্রিক- ভাবেই অপরাধের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গেছে। তবে মোট অপরাধ বৃদ্ধির তুলনায় নাবালক অপরাধ বৃদ্ধির পরিসংখ্যানে দেখা গেছে— নাবালক অপরাধের সংখ্যা মোট অপরাধের ১ দশমিক ৫ শতাংশই রয়ে গেছে। এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে নাবালক অপরাধীর পুনঃঅপরাধে যুক্ত হওয়ার ঘটনা ১২ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

যারা ভাবছেন, ১৬ বছর বয়সী একটি ছেলেকে জেলে পাঠালে নাবালক অপরাধ বন্ধ হয়ে যাবে, তারা সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিকে অবজ্ঞা করছেন। নাবালকদের বেশিরভাগ যারা আইন ভাঙ্গছে, তারা সমাজের কোন অংশের? ১৯১৪ সালে ৪৮ হাজার ২৩০ জন কিশোর সংশোধনাগারেরর আবাসিকদের মধ্যে মাত্র ৪৩৯ জনের পরিবারের বাৎসরিক আয় চার লক্ষ টাকার উপর। ৩ হাজার ৭০০ জনের পরিবারের আয় মাসিক ৫ হাজার বা বাৎসরিক ৫০ হাজার টাকার কম। তার মানে এই নয় যে, গরিব পরিবারের নাবালক বলে কারও অপরাধ গ্রাহ্য করা হবে না। তবে নাবালক অপরাধের বিষয়টি আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না এনে যদি মনে করা হয় ১৬ বছরের নাবালক অপরাধীদের সাবালকদের জেলে পাঠিয়ে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে, তবে তার পরিণতি হবে শত শত কিশোরকে অপরাধীতে পরিণত করা।

আমেরিকার মত দেশের বিভিন্ন প্রদেশে নাবালকত্বের বয়সসীমা ১২ থেকে ১৪ বছর। সে দেশের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০০৯-১০ সালে ১৬ লক্ষ কিশোর কিশোরী নানা অপরাধ কর্মে গ্রেপ্তার হয়েছে। অপর একটি সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যে জানা

যায়, কোন নির্দিষ্ট দিনে সারা দেশে ১০ হাজার ছেলে- মেয়েকে বড়দের জেলে আটক থাকতে হয়। এটা কি নাবালক অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পথ? অবশ্যই নয়। বরং উলটোভাবে এটাই ঘটনা, সারা বিশ্বে, আমেরিকাতেই নাবালক অপরাধের হার সবচেয়ে বেশি।

ভারতে বর্তমানে নাবালক বিচার আইনে সর্বোচ্চ তিন বছর জেলের মেয়াদ সংশোধনীর মাধ্যমে বাড়ানো যেতে পারত। তিন বছর অন্তরীণ থাকার পর পরবর্তী মেয়াদের অর্ধেক সময় আত্মীয়দের সাথে বাড়ির পরিবেশে থাকার সুযোগ দিয়ে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করে নাবালক অপরাধীকে সংশোধন করার প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে। তাদের প্রতি প্রতিহিংসামূলক আচরণ করে সংশোধন করার উদ্যোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রশ্ন: কেরালার গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটি বেসরকারি কোম্পানি পরিচালিত সংগঠনের জয়ী হওয়া সম্পর্কে পার্টির প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহী।

উত্তর: কিটেক্স গ্রুপ একটি বেসরকারি কোম্পানি। এরা 'টুয়েন্টি- টুয়েন্টি' নামের একটি এন জি ও তৈরি করে ওই নামে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে। এর্নাকুলাম জেলার কিজাককম্বলম পঞ্চায়েতের ১৯ টি ওয়ার্ডেই এরা প্রার্থী দিয়েছিল। ১৭ টিতে বিজয়ী হয়েছে। এই পঞ্চায়েতে বিভিন্ন প্রকল্পে কোম্পানিটি প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে। জনসমর্থন সংগ্রহের জন্য এটা করা হয়েছে।

এটা প্রথম ঘটনা যেখানে একটি কোম্পানি এন জি ও তৈরি করে স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তাতে নানা প্রশ্ন উঠেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কর্পোরেটদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ঘটনা এটা। বোঝা গেল অর্থ ও সহায় - সম্পদ জড়ো করে একটি বড় কোম্পানি একটি কিংবা একাধিক পঞ্চায়েত দখল করে নিতে পারে। জানা গেছে কিটেক্স কোম্পানি ঐ পঞ্চায়েতে কিছু শিল্প ইউনিট স্থাপনে আগ্রহী ছিল। কিন্তু পূর্বতন পঞ্চায়েত সম্ভাব্য পরিবেশ দূষণের কথা চিন্তা করে কোম্পানিকে অনুমতি দেয়নি।

কিজাককম্বলমের ঘটনায় এন জি ও কিংবা অন্য কোনও মঞ্চ গড়ে তুলে নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বেসরকারি কোম্পানির স্থানীয় সংস্থা দখলের সুযোগ ও সম্ভাবনা প্রতিফলিত হচ্ছে। বনভূমিতে ও তপশিলী উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় প্রকল্প রূপায়ণের জন্য গ্রামসভার অনুমোদন নেওয়ার আইনি বাধ্যকতা রয়েছে। এখন গ্রাম পঞ্চায়েত দখলের

মধ্য দিয়ে গ্রামসভার অনুমোদনের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল।

এটাও গুরুতর প্রশ্ন যে এন জি ও কিংবা বেনামে কর্পোরেটদের নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া উচিত কিনা। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং পঞ্চায়েত আইনের যথাযথ সংশোধন করে কর্পোরেটদের স্থানীয় সংস্থা দখলের প্রয়াস রুখতে হবে।

প্রশ্ন: ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৭ নম্বর ধারায় সমকামিতামূলক সম্পর্ককে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সি পি আই (এম) কী ভাবছে? সুপ্রিম কোর্ট এই ধারাটির পর্যালোচনা করুক— এই দাবির প্রতি পার্টির সমর্থন আছে কি?

উত্তর: জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সি পি আই (এম)-ই প্রথম দাবি তুলেছে যে, সহমতের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের সমকামিতাকে অপরাধমুক্ত করা হোক। ৩৭৭ নম্বর ধারাটি সেকেলে। এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশ থাকার সময়ের আইন। সমকামিতামূলক সম্পর্ককে এই ধারায় বলা হয়েছে " অস্বাভাবিক অপরাধ"। এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাদের যৌন কার্যকলাপ সম্পর্কে ভিন্ন পছন্দ রয়েছে। তার জন্য তাদের আসামির কাঠগড়ায় তোলা কিংবা তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত নয়। পুরুষ, মহিলা ও তৃতীয় লিঙ্গের সমকামিতার অধিকার অনুমোদনের একটা বিশ্বব্যাপী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২০০৯ সালে দিল্লি হাইকোর্ট ৩৭৭ নং ধারাটিকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করে। হাইকোর্টের মতে এই ধারাটি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ১৪ নম্বর ধারার পরিপন্থী। ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের বাঁচার সমান সুযোগ ও আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার থাকবে। বিচারপতি এ পি শাহ-র নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যক বেঞ্চ রায় দেয় যে এই ধারা প্রযুক্ত হবে একমাত্র সহমতহীন যৌন সংসর্গ এবং নাবালক বয়সিদের সঙ্গে যৌন মিলনের ক্ষেত্রে। এই বিখ্যাত রায়কে সি পি আই (এম) সমর্থন করেছিল।

তারপর সুপ্রিম কোর্ট এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি সংগঠিত করে ২০১৩ সালে। সেখানেও দুই সদস্যক বেঞ্চ আপিলটি শোনে এবং রায় দেয়। রায়ে হাইকোর্টের রায় বাতিল হয়ে যায়। রায়ে আরও বলা হয় এ বিষয়ে সংসদেই আলোচনা হওয়া উচিত

এবং সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। এই রায়টি ছিল পশ্চাৎমুখী, যেখানে সহমতের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের পছন্দ অনুযায়ী যৌন অধিকার হরণ করা হয়। এই রায়ে সমকামিতাকে পুনরায় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

সম্প্রতি এ বছরের ২ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট এই রায়ের বিরুদ্ধে একটি সংশোধনমূলক আরজির শুনানি সংগঠিত করে এবং ৫ সদস্যক বেঞ্চের কাছে বিষয়টি হস্তান্তর করে। আশা করা হচ্ছে যে শীর্ষ আদালত তার পূর্বেকার রায়টি পর্যালোচনা করবে এবং সমলিঙ্গের যৌন মিলনকে অপরাধ মুক্ত বলে স্বীকৃতি দেবে। সি পি আই (এম) মনে করে সমকামিতাকে অপরাধ বিমুক্ত করার ঘোষণা ভিন্ন পছন্দের যৌন মিলনকারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে।

প্রশ্ন: তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে বিশাল অঙ্কের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ভোটারদের মধ্যে অর্থ ও নানা সামগ্রী বিলি করা হয়েছে সর্বত্র। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাবে? সি পি আই (এম) এ বিষয়ে কী ভাবছে?

উত্তর : তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে অর্থশক্তি এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। আপনার এ বক্তব্য সঠিক। এ আই ডি এম কে এবং ডি এম কে— উভয় দলই শত শত কোটি টাকা খরচ করেছে। এ কারণে নির্বাচন কমিশন আরাভাকুরুচি ও তাঞ্জাভোড় কেন্দ্র দুটিতে নির্বাচন স্থগিত করে দেয়। প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও নানা সামগ্রী ভোটারদের মধ্যে বিলি করার অভিযোগে এ দুই কেন্দ্রে নির্বাচন বাতিল করা হয়। প্রথমে এই অভিযোগে নির্বাচন স্থগিত করা হয় এবং পরে যখন ভোটারদের মধ্যে নগদ অর্থ ও নানা সামগ্রী বিলি অব্যাহত থাকে তখন এই দুই কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করা হয়। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের এই সীমিত পদক্ষেপ সমস্যাটির গভীরতা জানান দিচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশন এ ধরনের গভীর সমস্যা মোকাবিলায় কতটা ক্ষমতাহীন তার প্রমাণ মিলেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে এই অর্থশক্তির ব্যবহার কীভাবে মোকাবিলা করা যায়? প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তার রাজনৈতিক দল নির্বাচনে কত টাকা খরচ করেছে তা খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। এজন্য সংশ্লিষ্ট আইনগুলি সংশোধন করা প্রয়োজন। অর্থশক্তির ব্যবহারকারী প্রার্থীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের হাতে আরও ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার করে রাষ্ট্রীয় খরচে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ হবে সামগ্রী ও নগদ অর্থে। পোস্টার, ইস্তাহার, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সময় বরাদ্দ, প্রচারের গাড়ির তেল খরচ ইত্যাদি খাতে অনুমোদিত রাজনৈতিক দলগুলির ব্যয়ভার রাষ্ট্রকে নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় খরচের ব্যাপারে আরও নানা ধরনের প্রস্তাব আসতে পারে — সেগুলোও বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে এবং অধিকাংশের সমর্থনপুষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত হবে। নির্বাচনী সংস্কারের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অর্থশক্তির ব্যবহার প্রতিরোধে প্রধান ভূমিকা নিতে পারে।

তৃতীয়ত, বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমান পদ্ধতি হচ্ছে নির্বাচন কেন্দ্রভিত্তিক যে প্রার্থী বেশি সংখ্যক ভোট পায়, তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। সি পি আই (এম) দীর্ঘসময় ধরে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি জানিয়ে আসছে, যেখানে আংশিক তালিকা পদ্ধতিও অন্তর্ভুক্ত হবে। তার অর্থ হচ্ছে সংসদ ও বিধানসভার ৫০ শতাংশ আসন বরাদ্দ হবে পার্টির প্রার্থীর তালিকা অনুযায়ী এবং বাকি ৫০ শতাংশ আসন থাকবে কেন্দ্রভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের জন্য। পার্টি বা জোট কত শতাংশ ভোট পেল তার উপর নির্ধারিত হবে কোন্ পার্টি বা জোটের প্রার্থী তালিকা থেকে কতজন নির্বাচিত হবেন।

বিশ্বজুড়ে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বহু রকমফের আছে। পূর্ণাঙ্গ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা যেখানে চালু আছে সেখানে প্রাপ্ত ভোটের হার অনুযায়ী শুধু পার্টির তালিকার প্রার্থীদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হবেন। ভারতের ক্ষেত্রে প্রস্তাব হয়েছে মিশ্র সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের। এ ক্ষেত্রে একজন ভোটারের দুটো করে ভোট থাকবে। একটা ভোট থাকবে পার্টি তালিকার জন্য, অন্যটি থাকবে কেন্দ্রভিত্তিক সর্বোচ্চ ভোটে নির্বাচিত করার জন্য। প্রাপ্ত ভোটের হার অনুযায়ী পার্টি তালিকা থেকে ও কেন্দ্রভিত্তিক আসনে জয় নির্ধারিত হবে।

সি পি আই (এম) ধারাবাহিকভাবে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি করে আসছে। তাতে ভোটারদের প্রভাবিত করতে তথাকথিত প্রভাবশালী প্রার্থীদের অর্থশক্তি ও বাহুবল ব্যবহারের প্রচলিত পদ্ধতির অবসান ঘটবে। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা চালু হলে বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজের ভালো প্রতিনিধিত্বের সুযোগও নিশ্চিত করা যাবে।

প্রশ্ন : ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা তুলে দিয়েছিল কেন?

উত্তর: শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার যে নীতিটি কার্যকরী করেছিল তা হচ্ছে প্রাথমিক

স্তরে শুধু মাতৃভাষাই পড়ানো হবে। শিক্ষাবিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদদের অধিকাংশেরই মতামত ছিল শিশুদের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাদের শিক্ষাদানের এ হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। প্রাথমিক স্তরের পর অতিরিক্ত ভাষা শিক্ষায় আপত্তি নেই। সে পর্যায়ে তাদের একাধিক ভাষা শিখতে অসুবিধা হবে না। এই বোঝাপড়ার উপর দাঁড়িয়েই বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক স্তরে বাংলা কিংবা মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু করে। এবং প্রাথমিক স্তরে একটি ভাষা পড়ানোর নীতি কার্যকর করেছিল।

অবশ্য, কয়েক বছর পর দেখা গেল যে অনেক মানুষই চাইছেন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শেখানো হোক এবং সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছিল। কারণ, বেসরকারি স্কুলগুলিতে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ানো অব্যাহত ছিল। মধ্যবিত্ত অংশের অনেক মা- বাবা নিজেদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। শিশুকালে ইংরেজির ভিত্তি শক্ত না হলে তদের সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কায় ছিলেন।

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ানোর ক্রমবর্ধমান এই দাবির প্রেক্ষিতে বামফ্রন্ট সরকার পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা চালু করে। যদিও ভারতের মতো দেশে যেখানে সাক্ষরতার হার কম সেখানে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার নীতি সঠিক ছিল। কিন্তু ইংরেজির অধিপত্য এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে যেখানে ইংরেজি শেখানোর দাবি জনপ্রিয় দাবিতে পরিণত হয় এবং বামফ্রন্ট সরকারকে এই জনমত বিবেচনায় আনতে হয়েছিল।

প্রশ্ন : শালকিয়া প্লেনামের (ডিসেম্বর, ১৯৭৮) দু'মাস পর হিন্দি সাপ্তাহিক লোকলহর -র আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৮ সালে এর প্রচার সংখ্যা ১৫ হাজার পৌঁছে। পার্টিতে নতুনদের আগমন এবং পার্টি পত্রিকা পড়ার অভ্যাস তাতে প্রতিফলিত হয়েছিল। ২১ তম পার্টি কংগ্রেসের সময় পার্টি সভ্যসংখ্যা ছিল ১০,৫৮,৭৫০। কিন্তু লোকলহর-র প্রচার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৮ হাজারে। তখন এবং আজকের পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য কি? পত্রিকার প্রচার সংখ্যা কমার কারণ কি?

উত্তর : ২১ তম পার্টি কংগ্রেসে বিবৃত তথ্য থেকে দেখা যায় পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রগুলির প্রচার সংখ্যা কমেছে। ২০ তম কংগ্রেসের সময়ও লোকলহর-র প্রচারসংখ্যা ছিল ১০,৩৫৪। এটা ২১ তম কংগ্রেসের সময় কমে দাঁড়িয়েছে ৮,০৩১- এ। পিপলস

ডেমোক্র্যাসি ও লোকলহর— উভয় পত্রিকাই সবচেয়ে বেশি চলতো পশ্চিমবঙ্গে। গত তিন বছরে ওই রাজ্যে লোকলহর-র প্রচার সংখ্যা কমেছে। ওই রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতি পার্টি সংগঠন, পত্রিকা চালানোর কাজকে প্রভাবিত করেছে। তাছাড়া, হিন্দি ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে লোকলহর-র প্রচার সংখ্যা প্রায় একই জায়গায় রয়ে গেছে, কয়েকটি রাজ্যে কমেছেও। এটা হিন্দি বলয়ে পার্টি সংগঠনের দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। পার্টি পত্রিকা রাখা ও পড়া এবং প্রচার সংখ্যা বাড়ানোর গুরুত্ব পার্টি সভ্য ও দরদিদের বোঝানো যায়নি। পার্টি পত্রিকার প্রকাশনা, গ্রাহকদের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো এবং প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্তব্য। পার্টির এই কাজটির ওপর আমাদের জোর দেওয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রশ্ন: নিরপরাধ মানুষদের উপর হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর আক্রমণের (যেমন , দাদরির হত্যাকাণ্ড) নিন্দা করতে গিয়ে পার্টি হিন্দুত্ববাদী শক্তি কিংবা সন্ত্রাসী শব্দটি ব্যবহার করে। কিন্তু, সম্প্রতি প্যারিসে জিহাদি বা আই এস আই এস যখন নিরীহ মানুষদের হত্যা করে,তখন পার্টির বিবৃতিতে তার নিন্দা করা হলেও আই এস আই এস কিংবা জিহাদি অথবা মুসলিম মৌলবাদী শক্তির নাম ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়নি। বিবৃতিতে শুধু সন্ত্রাসী হামলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশকে সন্ত্রাসবাদীদের জন্মদাতা ও মদতদাতা বলে সঠিকভাবেই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ যারা ঘটালো, সেই মুসলিম মৌলবাদীদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে পার্টির উদাসীনতা পরিলক্ষিত হলো কেন? এটা কি হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারকে সাহায্য করছে না? যে প্রচারে বলা হচ্ছে পার্টি হিন্দু সন্ত্রাসীর আক্রমণে যেভাবে হিন্দুত্ববাদীদের নামোল্লেখ করে, মুসলিম সন্ত্রাসবাদী কিংবা জিহাদিদের দ্বারা সংঘটিত হামলায় হামলাকারীদের নাম উল্লেখে অনীহা দেখায়। এটা কেন হবে? এর ব্যাখ্যা জানতে আগ্রহী।

উত্তর: আপনি ঠিকই ধরেছেন। সাম্প্রতিক প্যারিসের সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করে পার্টি যে বিবৃতি দিয়েছে তাকে শুধু সন্ত্রাসবাদী হামলাই বলা হয়েছে। আই এস আই এস কিংবা জিহাদি অথবা মুসলিম সন্ত্রাসবাদী/ মৌলবাদীদের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু, এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হবে না যে সন্ত্রাসবাদীদের গোষ্ঠী চিহ্নিত করতে পার্টির কোনও দ্বিধা বা সংশয় আছে। এর থেকে এটা মনে করা

আরও ভুল হবে যে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় নীতি হিসাবে কিংবা ছাঁচে ফেলে পার্টি শুধু হিন্দুত্ববাদীদেরই নাম উল্লেখ করে, অনুরূপ হামলার দায়ে অভিযুক্ত ইসলামি শক্তিগুলির নাম উল্লেখ না করে তাদের প্রতি নরম মনোভাব দেখায়।

সব সন্ত্রাসী হামলাই সমান ভাবাবেগ তাড়িত হিংস্রতা। সি পি আই (এম) সাধারণত হামলাকারী গোষ্ঠীগুলির কিংবা যে ধর্মমতের নামে তারা পরিচিত হওয়ার দাবি করে, সেসব নামেই সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে থাকে। তবে পার্টি সবসময় সচেতন থাকে যাতে কোনও গোটা সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা না হয়। সাধারণত আমরা 'ইসলামপন্থী' কিংবা 'হিন্দুত্ববাদী' হিসাবে আখ্যায়িত করি যা কি না কোনও 'ধর্মের বা কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের' নামের অপব্যবহারজনিত রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। এগুলি মৌলিকভাবে রাজনৈতিক পরিচিতি, ধর্মীয় পরিচিতি নয়। এই পার্থক্যটা মনে রাখার দরকার আছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের মধ্যে পার্টি কোনও পক্ষেরই সমর্থক নয়। এরা একে অন্যকে পরিপুষ্ট করে এবং জনগণের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে দুর্বল করে। ২১ তম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ''সংখ্যালঘুদের উপর হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলির প্রচণ্ড আক্রমণ সংখ্যালঘুদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করছে। সুতরাং, সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও আমাদের সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। তা না হলে এটাই আবার সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে আগ্রাসী হতে প্ররোচিত করবে।''

সি পি আই (এম)-র যে বিবৃতিটির কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, তার খসড়া তখন দিল্লিতে চলা কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত হয়েছিল। বিবৃতিটির খসড়া যখন তৈরি হয় তখন সবেমাত্র প্যারিস হামলা সংঘটিত হয়েছে, কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তখনও পূর্ণাঙ্গ তথ্য হাতে আসেনি, এই হামলার জন্য দায়ী কারা এটা চিহ্নিত করা এবং বিবৃতিতে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা সম্ভব ছিল না। আপনি নিশ্চয়ই এটা বুঝবেন যে, সাধারণভাবে যেটা আমরা বলে থাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী শক্তিগুলির দ্বারা পশ্চিম এশিয়ার সামরিক অভিযানের সঙ্গে সন্ত্রাসী হামলাগুলির যোগসূত্র রয়েছে, তখন পর্যন্ত যথেষ্ট প্রমাণাদির অভাবে সাধারণ বিশ্লেষণকে সুনির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করাটা সমীচীন হতো না।

আমরা মনে করি, ভারতীয় পরিস্থিতিতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের বিপদ মোকাবিলার

প্রয়োজনীয়তাকে কোনওভাবেই অস্বীকার করার সুযোগ নেই। হিন্দুত্ববাদী প্রচার যন্ত্র সংখ্যালঘু বিরোধী, বিশেষ করে মুসলিম বিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে রাত-দিন সক্রিয় রয়েছে। তারা ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে এক করে প্রচার চালাচ্ছে। তাদের সাধারণ প্রচার হচ্ছে " সব মুসলিম হয়তো সন্ত্রাসবাদী নয়, কিন্তু সব সন্ত্রাসবাদীই মুসলিম।" এ অবস্থায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ করে তাদের দ্বারা সংঘটিত সব মুসলিমের গায়ে সন্ত্রাসবাদী তকমা এঁটে প্রচার চালানোর বিরোধিতা তো করতেই হবে। হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি যখন আমাদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে বলছে যে এই পার্টিটা হিন্দুত্ববাদীদের উপরই কেবল দোষ চাপাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে যে তারা হতাশা থেকে এই অপপ্রচার চালাচ্ছে যে তারা মুসলিম ও ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকে যুক্ত করার সুযোগ কাজে লাগাতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

প্রশ্ন: ' ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'পন্থনিরপেক্ষ'—এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য কি? সংঘ পরিবার কেন 'পন্থনিরপেক্ষ' শব্দটির প্রতি বেশি অনুরক্ত?

উত্তর: আর এস এস ও তার সংঘ পরিবার (বিজেপিসহ) একটি প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রকল্পটি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তরের কাজ। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে পন্থনিরপেক্ষতা শব্দটি ব্যবহার করছে। এটাও এই প্রকল্পের অংশ। যেহেতু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে এখনই সরাসরি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলতে পারছে না, যদিও ওই দলের সিকি- আধুলি নেতারা হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকাশ্যেই ওকালতি করছেন, সেজন্য তারা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির বিরুদ্ধে অনবরত আঘাত হানতে সচেষ্ট রয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে দুর্বল করে পন্থনিরপেক্ষতার ধারণাকে পরিপুষ্ট করে তারা চাইছেন হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় একটু জায়গা করে নিতে।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। অতি সম্প্রতি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি'র প্রবীণ নেতা রাজনাথ সিং, ডঃ আম্বেদকরের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও সংবিধান নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে আহূত সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে পন্থনিরপেক্ষতা শব্দের ব্যবহারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকেই আক্রমণ করে তার ভাষণ শুরু করেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে দেশের সবচেয়ে অপব্যবহৃত শব্দ বলে আখ্যায়িত করেন। এটা মনে

করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, মোদির রাজত্বে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে দুর্বল করার প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, রাজনাথ সিং তার প্রতিই কটাক্ষ করেছেন এবং রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকা সম্পর্কিত উত্থাপিত যাবতীয় দাবির বৈধতা সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতা বদলে দিয়ে একমাত্র পন্থনিরপেক্ষতার ব্যবহার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়ণের একটি হাতিয়ার বই কী?

ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা হচ্ছে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ। আমাদের দেশে অনেকে আবার ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সব ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সম আচরণ ও সর্বধর্ম সমন্বয়কে বোঝাতে চান। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের মত বহু ধর্মের দেশে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বধর্ম সমন্বয় কথাটি একটি ন্যূনতম শর্ত হতে পারে। কিন্তু একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ন্যায্য দাবি হচ্ছে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের স্থান থাকা উচিত নয়। হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী গেরুয়াবাহিনী ধর্মনিরপেক্ষতার এই সংজ্ঞা মানতে নারাজ; এমনকি রাষ্ট্রের চোখে সব ধর্মের সমান অধিকারের ন্যূনতম শর্তটিরও তারা বিরোধিতা করে এবং রাষ্ট্র ও সরকারের ওপর সর্বদা হিন্দু আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি চাপানোর চেষ্টা করে। তাদের মতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাষ্ট্র ও ধর্মের বিযুক্তিকরণ — এই ধারণা পশ্চিমী এবং তারা, এমনকি, ধর্ম ও ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। এভাবে তারা শুধু হিন্দু ধর্মীয় মতকেই ধর্ম বলতে রাজি এবং অন্য সব ধর্মকেই ইসলাম, খ্রিস্টিয় ইত্যাদিকে ধর্ম সম্প্রদায়, কিংবা পন্থ হিসাবে আখ্যায়িত করে।

এখান থেকেই তারা দাবি করে হিন্দু ধর্মেরই কেবল সহজাত নৈতিক মূল্যবোধ ও কর্তব্য রয়েছে, অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়, বা পন্থের ক্ষেত্রে তা নেই। তাদের কথামতো, হিন্দু ধর্মের এই নৈতিক মূল্যবোধ প্রকৃতিতে সর্বজনীন এবং এর মাধ্যমেই ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। অন্যদিকে, তাদের অনুকম্পাসুলভ বক্তব্য, ইসলাম, খ্রিস্টিয়, ইত্যাদি ধর্মীয় সম্প্রদায়, কিংবা পন্থও হিন্দু ধর্মীয় অন্যান্য পন্থের মতো (জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদির মতো) রাষ্ট্রের নিকট সম আচরণ দাবি করতে পারে। সুতরাং, সংঘ পরিবার ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে পন্থনিরপেক্ষতা বলাটাকেই শ্রেয় মনে করে। কারণ, হিন্দু ধর্মই একমাত্র ধর্মের উচ্চতর স্তম্ভমূল এবং অন্যগুলি নিম্নস্তরীয় আশ্রয়ে আশ্রিত। এই যুক্তিতে হিন্দু ধর্মের ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করতে সংঘ পরিবার ন্যায্যতা খোঁজে। এটা নিশ্চিতভাবেই হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকেই নিয়ে যায়।

সন্দেহ নেই, রাজনাথ সিং আক্ষরিক অর্থে ঠিকই বলেছেন যখন তিনি সংবিধানের সরকারি হিন্দি অনুবাদ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে গিয়ে পন্থনিরপেক্ষ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সংবিধানের সরকারি হিন্দি অনুবাদে। এটা হয়েছে ১৯৮৭ সালে সংবিধানের ৫৬ তম সংশোধনীর পর। এই সংশোধনীতে সংবিধানের নিয়মিত সময়োপযোগীকরণ ও হিন্দি অনুবাদ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কোনও বিস্তৃত আলোচনা ছাড়া ও বিরুদ্ধ মতের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার বিবেচনায় না এনে কী করে এই 'পন্থনিরপেক্ষতা' শব্দটি সংবিধানের সরকারি হিন্দি অনুবাদে স্থান করে নিল, এতো এক মজার কাহিনি। সে যা-ই হোক, সেকুলার শব্দের হিন্দি অনুবাদ পন্থনিরপেক্ষ নয়, ধর্মনিরপেক্ষই ব্যাপক গ্রাহ্যতা পেয়েছে।

কিন্তু এটা শুধু এই প্রশ্ন নয় যে, কেউ ধর্মনিরপেক্ষ বলল, কেউ পন্থনিরপেক্ষ বলল, কী তাতে আসে যায়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাতিল করে পন্থনিরপেক্ষ শব্দের অনুপ্রবেশ— হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকেই এক ধাপ এগোনোর চেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

প্রশ্ন:(ক) হিন্দুদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেরালার জনগণের একাংশকে হতাশ করেছে। কেরালায় আর এস এস, বিজেপি ও জাতপাতের সংগঠনগুলির শক্তি বৃদ্ধির পেছনে এটা একটা কারণ হতে পারে। আমার এ ধারণা কি সত্যি?

(খ) বামেরা যখন রাজ্য সরকারে আসে, তখন শিক্ষামন্ত্রী করা হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজনকে, অথবা সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বকারী কোনও শরিক দল থেকে। এটা কেন হচ্ছে?

(গ) অনেক হিন্দু মন্দির সরকারি সম্পত্তি হিসাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু একটিও মসজিদ কিংবা গির্জার ক্ষেত্রে এমনটি করা হয়নি। এল ডি এফ কিংবা ইউ ডি এফ উভয় সরকারের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

উত্তর: সি পি আই (এম) কেরালায় সংখ্যাগুরু হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যালঘুদের প্রতি বেশি আনুগত্য দেখাচ্ছে— এ কথাটি বিজেপি- আর এস এস'র প্রচারের অঙ্গ। একথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সি পি আই (এম) এমন একটি দল যারা সব ধর্মের শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে সংগ্রাম চালায়। বিভিন্ন ধর্মমতের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত অংশের জনগণের সমর্থনপুষ্ট বলেই সি পি আই (এম) রাজ্যে একক বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে পার্টির দৃঢ় অবস্থানের জন্য সব ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তি, তা সে সংখ্যাগুরু কিংবা সংখ্যালঘু, সি পি আই (এম)'র বিরোধিতা করে আসছে। সি পি আই (এম) ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের বিরোধী বলেও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি যে প্রচার চালাচ্ছে, তা -ও অসত্য। আমাদের পার্টি নাগরিকদের যে কোনও ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের অধিকারের সপক্ষে দাঁড়ায়। পার্টি শুধু বিরোধিতা করে ধর্মীয় নেতাদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করাটাকে। যদি কেউ মহিলা ও জনগণের অন্য কোনও অংশের অধিকার হস্তক্ষেপ করতে ধর্মকে ব্যবহার করে, পার্টি তার বিরোধিতা করে। যেমন সম্প্রতি কেরলার একজন মুসলিম ধর্মীয় নেতা লিঙ্গ সাম্যের বিরোধিতায় যে মন্তব্য করেছেন সি পি আই (এম) তার তীব্র সমালোচনা করেছে।

সংখ্যালঘু অংশের কাউকে শিক্ষামন্ত্রী করা নিয়ে আপনার মন্তব্যটি ভুল স্থানে পরিবেশিত হয়েছে। হিন্দু, মুসলিম, কিংবা খ্রিস্টান, যে কেউই শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পেতে পারেন। বিবেচনার প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ ধরনের নীতি রূপায়িত করা হচ্ছে। যদি কোনও মন্ত্রী সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নীতি রূপায়িত করেন তাহলে তা সমর্থনযোগ্য নয় এবং তা বাতিল করতে হবে। বিগত এল ডি এফ মন্ত্রিসভায় (২০০৬- ২০১১) শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এম এ বেবি (আপনার বক্তব্যে যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে)। তাৎপর্যপূর্ণভাবেই এখানে উল্লেখ করতে হবে যে সে সময় বেবি নেতৃত্বাধীন শিক্ষা দপ্তর বেসরকারি প্রফেশনাল কলেজ ও সেল্ফ ফিনান্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনার নীতি গ্রহণ করেছিল। কেরালায় একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে গিয়ে আর এস এস সহ সব ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছে, করতে হবেও।

কী এল ডি এফ, কী ইউ ডি এফ— কোনও সরকারই কোনও হিন্দু মন্দির অধিগ্রহণ করেনি। বড় বড় হিন্দু মন্দিরগুলি পরিচালিত হয় 'দেবস্বম বোর্ড'-র মাধ্যমে। রাজ্য সরকার এ কাজ তদারকি করে। সরকারি তদারকির এই প্রথা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বাধীনতার আগে ত্রাভাঙ্কুর ও কোচিন নামের দুইটি সামন্ত রাজ্য ছিল। সামন্ততান্ত্রিক শাসকরা একসময় মন্দিরগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ভার গ্রহণ করে। এই পদ্ধতি দীর্ঘকাল চালু ছিল। এর আগে কালিকটের 'জামুরিন' (জমিদার) সমস্ত মন্দিরের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন যা পরে কোচিনের সামন্ত শাসকরা আত্মসাৎ করেন। এ নিয়ে সামন্ত প্রভু ও প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের মধ্যে লাগাতর সংঘর্ষ ও মন্দিরের কর্তৃত্বের ও সহায় সম্পদের মালিকানার অনবরত পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই কারণে মহারাজারা মন্দিরের কর্তৃত্বভার নিজেদের

হাতে তুলে নিয়েছিলেন। গোটা দেশে ব্রিটিশরাজ কায়েম হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে এই 'দেবস্বম বোর্ড' গঠিত হয়। এগুলি প্রথমে সামন্ত শাসকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার পর এই দায়িত্ব সরকারের হাতে আসে।

আজকের কেরালায় বড় বড় মন্দিরগুলি, যেগুলি আগে দেশীয় রাজাদের হাতে ছিল সেগুলির পরিচালনার দায়িত্বভার 'দেবস্বম বোর্ড'-র হাতে ন্যস্ত হয়। সুতরাং এসব মন্দির রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসাবে অনেক আগে থেকেই স্বীকৃত। এছাড়াও কিছু মন্দির বেসরকারি পারিবারিক মালিকানায় ও ট্রাস্টের হাতে রয়েছে।

এভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের উপর সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটেছে। মুসলিম ও খ্রিস্টানদের উপাসনার স্থান নিয়ে কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। এগুলি আগে যেমন ছিল তেমনি এখনও বেসরকারি মালিকানাতেই রয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হিন্দু মন্দির আর বেসরকারি পরিচালনায় মসজিদ ও গীর্জার বিষয়টিকে এক করে দেখা সঠিক নয়।

প্রশ্ন : ৬৫ বছর আগে আমাদের দেশের সংবিধান গৃহীত হয়েছে। এখনও কি জাতভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হওয়ার সময় হয়নি ? এটা কি যুক্তিগ্রাহ্য নয় যে সব গরীবেরই সরকারি চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ পাওয়া উচিত ?

উত্তর: সামাজিক, শিক্ষাগত ও আর্থিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির জন্য সংবিধানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। সংবিধানের এই ধারার প্রতি ব্যাপক সমর্থন পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ, আমাদের দেশে তপশিলী জাতি (আগে নাম ছিল অস্পৃশ্য) ও উপজাতিদের সামাজিক বৈষম্যের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। অন্যান্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের জন্যও এই সুযোগ সম্প্রসারিত করার সাংবিধানিক বিধান রয়েছে। কিন্তু, এই পদক্ষেপ তখন গ্রহণ করা যায়নি। আসলে ড. আম্বেদকর কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সময় তিনি লিখেছিলেন যে, অন্যান্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রণীত আইনটি পাস না করতে পারায় তিনি হতাশ হয়েছেন এবং আইনমন্ত্রীর পদ ছাড়ার পেছনে এটিও একটি কারণ।

সংবিধানের ১৬ (৪) ধারায় রাষ্ট্রকে মোট জনসংখ্যার মধ্যে তপশিলী জাতি ও তপশিলি উপজাতির জনসংখ্যার শতকরা হার অনুযায়ী চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তপশিলি জাতি (১৫ শতাংশ) এবং তপশিলি

উপজাতি (৭.৫ শতাংশে)-দের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সব দপ্তরে (সিভিল সার্ভিসসহ), অধিগৃহীত সংস্থা, বিধিবদ্ধ সংস্থা ও আধা সরকারি সংস্থা এবং সরকারি পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এই ধারা প্রযোজ্য হবে। একমাত্র বিচার বিভাগ ও সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।

সংবিধানের ১৫ (৪) ধারা অনুযায়ী শিক্ষা ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, সরকারি কারিগরি, প্রযুক্তি ও ডাক্তারি পড়ার প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই নিয়ম চালু রয়েছে। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এই ধারা রূপায়ণে বৃত্তি, তপশিলী জাতি - তপশিলী উপজাতিদের ছাত্রাবাস, ফিস কমানো, বুক গ্র্যান্ট এবং বিশেষ কোচিং ইত্যাদির জন্য সরকারি অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

প্রতি ১০ বছর অন্তর সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়মিত নবীকৃত হয়ে আসছে। সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলি এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কারণ সরকারি সমীক্ষা ও শিক্ষাগত গবেষণায় দেখা যাচ্ছে আজও তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি জনগোষ্ঠী শিক্ষা, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে দারুণভাবে পিছিয়ে আছে।

সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর অনগ্রসর শ্রেণী/ সম্প্রদায়গুলির জন্য সংরক্ষণ দাবি বারবার উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বহু কমিশন গঠন করেছে। কমিশনগুলিকে এ সম্পর্কে সুপারিশ করতে বলা হয়েছে। মণ্ডল কমিশনই শেষ কমিশন, যাদের সুপারিশ ভি পি সিং নেতৃত্বাধীন জনতা দলের সরকার গ্রহণ করেছিল ১৯৮৯ সালে। সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল সব ধরনের সংরক্ষণ মিলিয়ে ৫০ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ চলবে না। সেই অনুযায়ী সরকারি চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। আমাদের পার্টি এই পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানায় এবং ' ক্রিমিলেয়ার'-দের এই সংরক্ষণের আওতার বাইরে রাখার নীতিকে সমর্থন করে। 'ক্রিমিলেয়ার'দের বাদ দিয়ে ওবিসি সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিভিন্ন রাজ্যে চালু হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের তাৎপর্য হলো সাধারণ শ্রেণীভুক্ত ও অন্যান্য অংশের মানুষ চাকরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশের সুবিধা ভোগ করতে পারেন। এই শতকরা হার বাস্তবে অসংরক্ষিত বা সাধারণ ক্যাটাগরির জনসংখ্যার হারের চেয়ে অনেক বেশি। এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, নাগরিকদের মধ্যে অন্যান্য ক্যাটাগরির লোকজনও আছেন

যাদের জন্য সংরক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হয়েছে। যেমন কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের পরিবার, পাঞ্জাবে এক মেয়ে সন্তানের পরিবার, ঘরছাড়া কাশ্মীরি পণ্ডিত, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সন্তান ও নাতি- নাতনি, প্রতিবন্ধী, ক্রীড়াবিদ, পূর্বতন সৈনিক, যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের উপর নির্ভরশীল পরিবার, মৃত সরকারি চাকুরেদের সন্তান - সন্ততি এবং অধিগৃহীত সংস্থার কর্মীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে এসব সুবিধা ভোগ করার সুযোগ রয়েছে। এমনকি কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবাসী ভারতীয়দের (এন আর আই) জন্যও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। রঙ্গনাথন কমিশন দলিত খ্রিস্টান ও মুসলিমদের জন্যও সংরক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করার সুপারিশ করেছে। আমাদের পার্টি রঙ্গনাথন কমিশনের এই সুপারিশের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত রায়ের জন্য কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা যাচ্ছে না।

এটা ঠিকই যে গরিব ঘরের সন্তানদের জন্যও সংরক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা উচিত। আমাদের পার্টি তা সমর্থনও করে, কিন্তু সেই সুপ্রিম কোর্টের রায়ই এক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

আমাদের পার্টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে বেকার সমস্যা সমাধান এবং গুণগত শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা কেবলমাত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব নয়। যদিও সংরক্ষণ প্রথা যুগ যুগ ধরে যারা সামাজিক বৈষম্যের শিকার তাদের কিছুটা হলেও স্বস্তি দিচ্ছে ও সাহায্য করছে। বেকারি ও গুণগত উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চনা— এই দুই সমস্যার সমাধানে সরকারের নীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনা ছাড়া বিকল্প পথ খোলা নেই।

প্রশ্ন: এই যে বারেবারে খরা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, এটা কেন হচ্ছে? কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল নীতির দীর্ঘমেয়াদি কুফল কীভাবে এই পরিস্থিতি তৈরি করছে, এ সম্পর্কে একটু বুঝিয়ে বলবেন কি? এ বছরের খরা পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? এ অবস্থা থেকে উত্তরণের আশু ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান কী?

উত্তর: ১. ভারতে ঘন ঘন খরা পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্র দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান জলকণার দীর্ঘকালীন স্বল্পতা আবহগত খরা পরিস্থিতিকে ত্বরান্বিত করছে। আমাদের কাজের ফলে জলের

দুষ্প্রাপ্যতাজনিত খরা সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন— লেইক, দিঘি, জলাশয় , মাটি বা শিলার যে স্তর দিয়ে জলবাহিত হতে পারে, কিংবা জল প্রবেশ করতে পারে এসব উৎস বা প্রবাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করার ফলে জলস্তর নিচে নেমে যায়। এগুলোর ক্ষতিপূরণেরও কোনও চেষ্টা নেই।

কৃষি সংক্রান্ত খরার পেছনে কারণ হচ্ছে ভূমিক্ষয়, যার ফলে জৈব পদার্থ কমে যায় ও আর্দ্রতা বিনষ্ট হয়।

নানা কারণে ভূমিক্ষয় হয়। গাছগাছড়ার অভাব ও ভূমিক্ষয় রোধের অক্ষমতা। এই সবগুলো কারণ একসঙ্গে মিলে বিভিন্ন ধরনের খরা পরিস্থিতি ভারতে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা শুধু পরিবেশগত কারণেই হচ্ছে তা নয়। মানুষের ভূমিকাও এর জন্য দায়ী। যেমন— অতিরিক্ত জলসেচ, বন নিধন, ভূমিক্ষয় ও অবনমন।

২ . দুইটি খরার মধ্যবর্তী সময় কমে আসছে। খরার স্থায়িত্ব বাড়ছে। খরাক্লিষ্ট এলাকার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। এ বছর দেশের ৩০০ টি জেলার তিন লক্ষ গ্রাম খরার কবলে পড়েছে। ১৯৮৬-৮৭'র পর এতো বড় খরা আগে দেখা যায়নি। এবার প্রায় ৫০ কোটি মানুষের জীবনে ভয়ানক দুর্দশা নেমে এসেছে। জল সংকট ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি প্রচণ্ড আকার নিয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের কোনও জরুরি পরিকল্পনা নেই। বি জে পি সরকার খরা দুর্গত জনগণের ত্রাণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে এমনকি খরাক্লিষ্ট এলাকায়ও কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই নগণ্য। তথ্য থেকে দেখা যায় ২০১৫- ১৬ সালে এসব দুর্গত এলাকায় যে কাজের সংস্থান করা হয়েছে তাতে মাত্র ১ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ পুরো ১৫০ দিনের কাজ পেয়েছেন। বি জে পি শাসিত রাজস্থানে এই হার মাত্র ০.২ শতাংশ বা তারও কম।

৩ . সরকারগুলি জলাশয়সমূহকে বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে এবং জল ব্যবস্থাপনা, নতুন জলাশয় খনন, কৃষিজ আর্থিক নীতি ও যৌথ মালিকানার উৎসগুলিকে বেসরকারি পুঁজি কবজা করে নিয়েছে। এগুলি জল সংরক্ষণ ব্যবস্থায় সহায়তা দিতে পারতো। মাটির নিচের জল ও যৌথ মালিকানাধীন উৎসগুলিও ধ্বংসের পথে। ফলে জলস্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। জলাশয়গুলি ভরাট করে জমি কারবারিরা ফাটকা ব্যবসায় নেমেছে। এসব করা হচ্ছে নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নামে। অত্যন্ত উচ্চ ফলনশীল

বীজ ও অন্যান্য উপাদানের ওপর নির্ভর করে নিবিড় চাষবাস হচ্ছে ও অতিমাত্রায় জলের অপচয় চলছে। এটাও চলতি কঠিন পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

৪ . এখন আশু কাজ হচ্ছে , খরা দুর্গত জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল ও কৃষিকাজের জল সরবরাহ করা। ব্যাপকভাবে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। খরা দুর্গতদের ভরতুকিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে আয়ের অবনমন রোধ ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাবে। ফলে অনাহার ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা ঠেকানো যাবে। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। মাঝারি সময়ের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে এম জি এন রেগাকে ব্যবহার করে প্রচুর সংখ্যক জলাশয় খনন করতে হবে। খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে জলসেচ - নির্ভর শস্য উৎপাদনের পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখা জরুরি। এসব এলাকায় অন্য ধরনের পরিবর্ত শস্য ফলানোর প্রতি উৎসাহ দিতে হবে। ধানের ফলন বাড়ানোর জন্য এখন চিরাচরিত যে পদ্ধতি চালু আছে, যেখানে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন, এইসব এলাকায় এমন ধরনের ধান বা খাদ্যশস্যাদির ফলনের প্রতি নজর দিতে হবে যেখানে জলের যোগান ৭৫ শতাংশ কম লাগবে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে মাটি বা শিলার যে স্তর দিয়ে জল বাহিত হয় কিংবা জল প্রবেশ করতে পারে সেগুলোকে পূর্ণ করার ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণ, কুয়ো, পুকুর, লেইক ও জলাশয়গুলির পুনঃ খনন, বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা, জল সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা, শস্যাদি ফলনের পরিবর্তন, কৃষি- বনায়ন এবং এ ধরনের অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

প্রশ্ন : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদে কোন নিয়োগ হচ্ছে না। সি পি আই (এম) এই সমস্যাটি বড় আকারে প্রচারে তুলে ধরছে না কেন?

উত্তর : কেন্দ্রীয় সরকার ও অধিকাংশ রাজ্য সরকার তাদের বিভিন্ন দপ্তরে পড়ে থাকা শূন্যপদগুলি পূরণ করছে না। বস্তুত, সরকারি নির্দেশেই এই শূন্যপদগুলিতে নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ৭ম পে কমিশনের তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার। অনুরূপভাবে রাজ্য সরকারি স্তরে এর চেয়েও বেশি সংখ্যক শূন্যপদ পড়ে রয়েছে।

সরকারি দপ্তর সংকোচনের লক্ষ্যে কতগুলি শূন্যপদ চুক্তিতে অথবা অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে।

সি পি আই (এম) বরাবরই দাবি করে আসছে যে সরকারি পদে নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হোক। "কর্মসংস্থান অথবা কর্মসংস্থান সাপেক্ষে বেকার ভাতার দাবিতে" পার্টির ২১তম কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল :

১। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং সরকার পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর ।

২। শূন্যপদের অবলুপ্তিকরণ বন্ধ কর, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শূন্যপদে নিয়োগ সম্পন্ন কর এবং স্থায়ী পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ কর।

বিভিন্ন আইনসভা ও বেকার বিরোধী বিভিন্ন প্রচারান্দোলনে পার্টি বরাবর এই দাবিগুলি তুলে ধরে।

বেকার সমস্যা ইস্যুতে সি পি আই (এম) ও বামেদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে কেরালায় সম্প্রতি নির্বাচিত বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের কাজে। সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের পরই মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার প্রথম সভায় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের শূন্যপদে নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। মন্ত্রিসভা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকারের কোন স্তরে কোন পদ শূন্য হলে, তা দশ দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে রাজ্যের জনসেবা আয়োগে এই পদ খালি হওয়ার জন্য জানাতে হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, বুর্জোয়া দলসমূহ পরিচালিত কোন রাজ্য সরকার বেকার সমস্যার প্রশ্নে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে না। সরকারি দপ্তরে নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে আমাদেরকে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।